সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ০৩-০৪

২৭ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার

শেখ ইব্রাহিম আল-ইব্রাহিমের মসজিদ, ভেনিজুয়েলা

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

.٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.১১.২৫	০৪:৪৮	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৬	১৬.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০২.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬	১৭.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০৩.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৫	১৮.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৪.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫	১৯.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৫.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২০.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৬.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২১.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৭.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৪	২২.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
০৮.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৩.১১.২৫	০৫:০০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০৯.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৪.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১০.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩	২৫.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১১.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২	২৬.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১২.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৭.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৩.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৮.১১.২৫	০৫:০৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৪.১১.২৫	০৪:৫৫	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩২	২৯.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৫.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১	৩০.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

২৭ অক্টোবর ২০২৫ ঈসায়ী
১১ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মোঃ আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২

◈ আল কুরআনুল হাকীম : ❖ ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাই মু'মিনের লক্ষ্য
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৩

◈ হাদীসে রাসূল ﷺ : ❖ দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৬

◈ প্রবন্ধ : ❖ উপদেশ প্রদানের আদব ও শর্তসমূহ হোসাইন মঈন- ০৯
❖ সভ্যতার বিকাশ আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৩

◈ প্রাসঙ্গিক ভাবনা : ❖ ইসকনের বর্বরতা, ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং...
তানযীল আহমাদ- ১৭

◈ ক্বাসাসুল হাদীস : ❖ প্রতিবেশীর প্রতি অহেতুক ধারণা : নিন্দনীয় কাজ
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৩

◈ বিশেষ প্রতিবেদন : ❖ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ : যৌক্তিক...
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী- ২৪

◈ আত্মগঠন : ❖ ... রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র
মো. মনিরুজ্জামান- ২৮

◈ নিভৃত ভাবনা : ❖ আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩১
❖ মশা মারতে কামান দাগা মো. কায়ছার আলী- ৩৩

◈ ভ্রমণ : ❖ ভূস্বর্গ কাশ্মির নাকি স্কটল্যান্ড? প্রফেসর ডা. দেওয়ান আ. রহীম- ৩৪

◈ শুব্বান পাতা : ❖ঐতিহ্যের পথ ধরে তারুণ্যের জয়যাত্রা : জমঈয়ত...
মুস্তাফিজুর রহমান মাসুদ- ৩৭

কবিতা ৪১
জমঈয়ত সংবাদ ৪২
শুব্বান সংবাদ ৪৩
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৬
প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

যোগাযোগ
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ ব্যবস্থাপক: ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিপণন: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১ weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com
Page: f/shaptahikArafat, f/groups/weeklyarafat

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ) | বাংলাদেশ : (বার্ষিক : ৭০০/- ষান্মাসিক : ৩৫০/-) | মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

সম্মিলিত উদ্যোগে সাফল্য আসবেই ইন্‌শাআল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গত ৪ অক্টোবর এক উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। এই কাউন্সিল ছিল ঐক্যের, আস্থার ও নব উদ্দীপনার এক অনুপম পর্ব। দেশের সকল জেলা থেকে আগত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, প্রজ্ঞাবান উপদেষ্টামণ্ডলী এবং বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি এ কাউন্সিলকে দিয়েছে এক ঐতিহাসিক মর্যাদা।

জমঈয়তের উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব এম. এ. সবুর-এর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন প্রথমে প্রথা অনুসারে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, গঠনতান্ত্রিক বিধি মোতাবেক কাউন্সিলরদের ন্যায়সঙ্গত ও বহুকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সরাসরি কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ নির্বাচনে মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী দ্বিতীয়বারের মতো জমঈয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন শুব্বানের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

কিছু ভুল বোঝাবুঝি থেকে কেউ কেউ হয়তো এই নির্বাচনকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রচলিত গণতন্ত্রে থাকে প্রার্থী, থাকে প্রচারণা, থাকে জনসমর্থনের প্রতিযোগিতা। অথচ জমঈয়তের এই নির্বাচনে ছিল না কোনো প্রার্থী, ছিল না কোনো প্রচারণা– ছিল কেবল আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ ও আমানতের চেতনা। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত ৩৪৭ জন কাউন্সিলর– যাঁরা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও ধর্মীয় সচেতনতার প্রতীক।

এরপর ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় নবগঠিত নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা। এ সভায় সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর সম্পাদনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন যথাক্রমে অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

সাপ্তাহিক আরাফাত শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান; তাওহীদী আদর্শচর্চার ধারাবাহিক প্রকাশনা। টানা ৬৭ বছর ধরে সালাফী 'আক্বীদাহ্ মানহায প্রচারের এক অবিরাম সংগ্রাম। এই পত্রিকার সূচনা হয়েছিল উপমহাদেশের আহলে হাদীসদের শ্রেষ্ঠ রাহবার, প্রাজ্ঞ আলেম, কলমযোদ্ধা ও দূরদর্শী সংগঠক আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর হাত ধরে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক ও বিজ্ঞ কলামিষ্ট, যেমন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিএবিটি (রাহিমাহুল্লাহ), মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (রাহিমাহুল্লাহ), প্রফেসর মোহাম্মদ হাসানুযযামান, অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতো মহৎ ব্যক্তিত্ব তাঁদের জ্ঞানের দীপ্তি ও ত্যাগের নির্যাসে সাপ্তাহিক আরাফাতকে জীবন্ত রেখেছেন।

বিশেষভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের প্রিয় অভিভাবক, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে, যিনি দীর্ঘ ৪৩ বছর জমঈয়ত ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর অবিরাম পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি ও আদর্শিক দৃঢ়তা আজও আমাদের পথচলার প্রেরণা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমীন।

আজ পৃথিবী প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছে গেছে। মানুষ বদলে গেছে, বদলে গেছে চিন্তা, রুচি, সংস্কৃতি ও জীবনধারা। কিন্তু পরিবর্তনের এই স্রোতে দাঁড়িয়ে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে– যুগ বদলালেও সত্যের আদর্শ বদলায় না। সাপ্তাহিক আরাফাত তার মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা চাই, এই পত্রিকা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে সত্য ও তাওহীদের আলোকে পথ দেখাক নতুন প্রজন্মকে।

এই দায়িত্ব শুধুই আমাদের নয়, এটি গোটা জমঈয়তের, প্রতিটি আহলে হাদীসপ্রেমী হৃদয়ের, প্রতিজন সচেতন মুসলিমের। তাই আসুন– আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও সহযোগিতার মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হই। যদি আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাই, সাফল্য আমাদের আসবেই ইন্‌শাআল্লাহ। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাই মু'মিনের লক্ষ্য

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী না গরীব (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয় ও আলোচ্য বিষয়

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের চতুর্থ সূরা, সূরা আন্-নিসা'র ১৩৫ নং আয়াত। এই সূরায় মোট ১৭৬টি আয়াত এবং ২৪টি রুকূ' রয়েছে। সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাকে মাদানী সূরা বলা হয়।

এই সূরাটির আলোচ্য বিষয় হলো দু'টি। **এক-** নারী, এতিম, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও পারিবারিক অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা। **দুই-** বৃহৎ পরিবার, মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়। যেমন- মুনাফিক্ব এবং তাদের সঙ্গীদের বিভিন্ন আলোচনা। এই আলোচ্য বিষয় থেকে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই সূরাতে মুসলিমদের জীবন পরিচালনা ও কীভাবে একতাবদ্ধ থাকতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপরে অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াতে নবী-রাসূল প্রেরণ ও ঐশী কিতাবসমূহ নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানব সমাজকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"[২]

এখানে ন্যায়নীতির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য 'মীযান' শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। না হয় একমাত্র এমন কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, যার মধ্যেই ন্যায়নীতি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবভিত্তিক ন্যায়নীতিই হলো প্রকৃত ন্যায়নীতি এবং তা প্রতিষ্ঠা করাই হলো মু'মিনের প্রধান কর্তব্য। মানুষের মনগড়া আইন প্রকৃত ন্যায়নীতির মানদণ্ড নয়। আয়াতে 'ধনী ও গরীবের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যাতে এর দ্বারা ন্যায়বিচার প্রভাবিত না হয়। অতঃপর 'ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাশালীরা সর্বদা নিজেদের সংগঠনপ্রীতি, দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে কৃত বে-ইনসাফীর কথা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে তাঁর বান্দাকে হুঁশিয়ার করে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন।

ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ– ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আল্লাহ দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। **এক-** আত্মীয়-স্বজন এবং **দুই-** দল-সংগঠন। আত্মীয়তার বিষয়টি সূরা আন্-নিসা'র আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দল ও সংগঠনের বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আন্-নিসা : ১৩৫।*

[২] *সূরা আর-হাদীদ : ২৫।*

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকো এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।”[৩]

লক্ষণীয় যে, সূরা আন্-নিসা'য় اَلْقِسْطُ বা ইনসাফকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আত্মীয়তা রক্ষাও তো আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। তার প্রতিবাদে اَلْقِسْطُ বা ইনসাফকে আগে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়বিচারের বিপক্ষে আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা কখনোই আল্লাহর জন্য হতে পারে না। অন্যদিকে সূরা আল-মায়িদাহ্'য় শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لِلّٰهِ অর্থাৎ- 'আল্লাহর জন্য' কথাটি আগে আনা হয়েছে। এর দ্বারা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ থাকার স্বভাবগত ভাবাবেগ থেকে সংযত থাকতে বলা হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায়বিচার করো। মোটকথা আলোচ্য সূরা আন্-নিসা ও একই মর্মে সূরা আল-মায়িদাহ্'য় বর্ণিত আয়াত দু'টির মর্মকথা হলো– **(১)** আত্মীয়-অনাত্মীয় বা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারে অটল থাকা এবং **(২)** আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, যাতে সুবিচার সম্ভব হয়।

উপরে বর্ণিত দু'টি প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ- আত্মীয়তা ও দলীয়তা হতে মুক্ত হওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তারা পরস্পরে যেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, তেমনি আত্মরক্ষার তাকীদে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য হাসিলে দল গঠন করাও তার স্বভাবজাত। এ দু'টির ভালো দিককে ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খারাপ দিককে নিন্দা করেছে। যেমন- বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ইসলাম কবুল না করা[৪] ও দলের দোহাই দিয়ে সত্যকে চিনেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া[৫]। ইহূদী-নাসারারা ইসলামের সত্য বুঝেও তা কবুল করেনি। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধনকে সর্বদা মযবূত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন করে[৬]। একইভাবে তিনি দলীয় পরিচয় অক্ষুন্ন রাখার অনুমোদন দিয়েছেন যতক্ষণ তা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন- আনসার ও মুহাজির নামের দলীয় পরিচয় আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন[৭]। আত্মীয়তা রক্ষা করা ও দলীয়তা বজায় রাখা তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন তা স্রেফ দুনিয়াবী কোনো হীন স্বার্থে হবে এবং তার লক্ষ্য 'হাবলুল্লাহ'কে বাদ দিয়ে 'হাবলুশ শয়তান'-কে আঁকড়ে ধরা হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا﴾

“তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[৮]

পরের আয়াতে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে,

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

“তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।”[৯]

তার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করো।”[১০]

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জাতীয় ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করছে দু'টি বিষয়ের উপরে– **(১)** আল্লাহভীতি, **(২)** সমবেতভাবে মহান আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করা। প্রথমটি না থাকলে মানুষ দুর্নীতিবাজ হবে এবং দ্বিতীয়টি না থাকলে সামাজিক ঐক্য ও ন্যায়নীতি বিনষ্ট হবে। অত্র আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখনই কোনো দল বা সংগঠন “হাবলুল্লাহ”কে বাদ দিয়ে স্রেফ ব্যক্তি পূজা ও অনৈসলামী আদর্শ পূজায় লিপ্ত হবে, সেই দল বা সংগঠন থেকে ঈমানদার ব্যক্তিকে বেরিয়ে আসতে হবে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে উক্ত দু'টি দোষ অর্থাৎ- দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি বর্তমান ছিল। যা উপরোক্ত দু'টি প্রতিষেধক অর্থাৎ- তাক্বওয়া ও হাবলুল্লাহ প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত হয় এবং সেই পতিত সমাজের লোকগুলো দুনিয়ার সেরা মানুষে পরিণত হয়। বাংলাদেশের

[৩] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৮।*
[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৭০।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৪৬।*
[৬] *সূরা বানী ইস্রা-ঈল/ইস্রা : ২৬।*
[৭] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১০০।*
[৮] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১০৩।*
[৯] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১০৫।*
[১০] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১০২।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বর্তমান পতিত সমাজকে উন্নত করতে গেলে ঐ একই প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে, অন্য কিছুই নয়।

বস্তুতঃ আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) হতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল এবং শতাধিক সহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানব সমাজে ইনসাফ ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। নৈতিক উপদেশ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফের পথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যারা অবাধ্যতা করেছে, তাদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায়ের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সরকার ও জনগণ সবাইকে ন্যায় ও ইনসাফের উপরে দৃঢ় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সত্য সাক্ষ্য ও বাস্তবতা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকো।"

সাক্ষ্যের অপরদিক হলো– সুপারিশ করা। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য ও সুপারিশ থাকলে তার পরকালীন সওয়াব অত্যধিক। আর বিপরীত হলে তার মন্দ পরিণতিও ভয়ংকর। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾

"যে ব্যক্তি ভালো কাজে সুপারিশ করে, সে তার নেকী পায় এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুপারিশ করে সে তার অংশ পায়।"[১১]

আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদান, আইনজীবীদের বাদী ও বিবাদী পক্ষ সমর্থন, নেতৃত্ব নির্বাচন সবই উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত। যদি কেউ জেনে-শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় নম্বর দেয় এবং কোনো উকিল যদি স্রেফ পেশার দোহাই পেড়ে জেনে শুনে মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহগার হবে।

অনুরূপভাবে জেনে-শুনে অযোগ্য নেতা নির্বাচনে সমর্থন দিলে ঐ ব্যক্তি ঐ নেতার যাবতীয় দুষ্কর্মের ভাগীদার হিসাবে গণ্য হবে। আদালতের সাক্ষ্য দানের ফলাফল সীমিত সংখ্যক লোকের উপরে বর্তায়। কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচনে সাক্ষ্য বা সমর্থন দানের তিনটি দিক রয়েছে। (১) সাক্ষ্য দান করা, (২) ব্যক্তিগত সুপারিশ করা, (৩) সামষ্টিক অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে নেতা হলেন সমষ্টির দায়িত্ব প্রাপ্ত। এই তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বকে সমর্থন দিলে নেতার যাবতীয় নেকীর কাজের সওয়াবের একটা অংশ যেমন সমর্থনদাতা পাবেন, তেমনি বিপরীতটা হলে তার মারাত্মক ফলাফলও সমর্থনদাতার 'আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। কারণ নেতার সঠিক বা বেঠিক সিদ্ধান্তের ফলাফল সমস্ত সমাজের উপরে পড়ে।

ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে বিষয়টি, তা হলো– ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার হলো শান্তির চাবিকাঠি।

ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উপায় : আলোচ্য আয়াতেই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। যার অর্থ কেবল মনে মনে মহান আল্লাহকে ভয় করা নয়; বরং তার অর্থ হলো– মহান আল্লাহর দেখানো পথে চলা এবং জীবনের সব স্তরে ওয়াহীর বিধান অনুসরণ করা।

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- সকল পরিস্থিতিতেই মু'মিনদের উচিৎ ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

দুই- স্বজনপ্রীতি, সংগঠন ও দলপ্রীতি সমাজে সাম্য-শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। সুতরাং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসবের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যিকারের ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তাক্বওয়াভিত্তিক ইসলামী সমাজগঠন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তিন- মিথ্যাসাক্ষ্য একটি গর্হিত অপরাধ (এটা কবিরা গুনাহ)। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পেতে চাইলে এটা পরিত্যাগ করতেই হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মিথ্যাসাক্ষ্য পরিত্যাগ করে সত্যসাক্ষ্য প্রদানের সৎসাহস দান করুন!

চার- স্বজনপ্রীতির কোনো প্রয়োজন নেই। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমাদের সকলের চাইতে আল্লাহ তা'আলাই বেশি শুভাকাংখী।

পাঁচ- পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের মধ্যে যারা বিচারক, দলনেতা, সরকার ও ওলামায়ে কিরাম তারা সহ প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই পথে চলার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

[১১] *সূরা আন্-নিসা : ৮৫।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

হাদীসের সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের পক্ষে জান্নাত।'[১২]

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শাম্স বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনা।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহররম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَأَما مَا وعد بِهِ الْمُؤمن بعد الْمَوْت من كَرَامَة الله فَإِنَّهُ تكون الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سجنا وَمَا للْكَافِرِ بعد الْمَوْت من عَذَاب الله فَإِنَّهُ تكون الدُّنْيَا جنَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَٰلِك.

'মৃত্যুর পর মু'মিনকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অফুরন্ত নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে কারাগারের মতো। অন্যদিকে মৃত্যুর পর কাফেরের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে 'আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে জান্নাতের মতো। অর্থাৎ- পরকালের অফুরন্ত সুখ বা দুঃখের বিবেচনায় দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য কারাগার বা জান্নাত হবে।'[১৩] ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مَسْجُونٌ مَمْنُوعٌ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ مُكَلَّفٌ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ الشَّاقَّةِ فَإِذَا مَاتَ اسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا وَانْقَلَبَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّعِيمِ الدَّائِمِ وَالرَّاحَةُ الْخَالِصَةُ مِنَ النُّقْصَانِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَصَّلَ فِي الدُّنْيَا مَعَ قِلَّتِهِ وَتَكْدِيْرِهِ بِالْمُنَغِّصَاتِ فَإِذَا مَاتَ صَارَ إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ وَشَقَاءِ الْأَبَدِ.

এর অর্থ হচ্ছে– প্রত্যেক মু'মিন (দুনিয়াতে) কয়েদী বা জেলখানায় বন্দী। কেননা দুনিয়াতে তার জন্য মাকরূহ বা অপছন্দনীয়, হারাম ও প্রবৃত্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কষ্টকর বিষয়গুলোতেও আনুগত্য করতে সে বাধ্য। অতঃপর যখন সে মারা যায় তখন এই বাধ্যবাধকতা থেকে

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।

[১২] সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১৫৮।

[১৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ; জামেউর রাসায়েল- ২/৩৬২।

সে স্বস্তি লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে অফুরন্ত সুখ-শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে কাফের দুনিয়ায় সে যা (ভালো কিছু) অর্জন করে তার প্রতিদান খুব সামান্যই পেয়ে থাকে (যার বিনিময়ে সে দুনিয়ায় ভালো থাকে)। অতঃপর যখন মৃত্যুবরণ করে তখন চিরস্থায়ী 'আযাব ও দুর্ভাগ্যের দিকে এগিয়ে যায়।[১৪]

বন্দিশালায় কোনো কয়েদি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। বন্দিজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্তৃপক্ষের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ আইন লঙ্ঘন করার অধিকার কোনো বন্দীর নেই। যখন যে আদেশ তাকে দেওয়া হয় সে আদেশ মানতে সে বাধ্য। বন্দী কখনো এ কথা বলতে পারে না যে, আমি এ আদেশ মানবো, অমুক আদেশ মানবো না। দুনিয়ার জীবনও মু'মিনের জন্য বন্দিশালার মতো। কারণ এখানে সে পূর্ণ স্বাধীন নয়। মন যা চায় তা সে করতে পারে না। দুনিয়ার প্রেমে প্রেমাসক্ত হয়ে মু'মিন আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো হুকুম পালন করতে পারে না।

মু'মিন দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। কেননা দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা পোষণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন লোভ-লালসা তাকে গ্রাস করে ফেলে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য তাই আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তারই নির্দেশ মোতাবেক হওয়া জরুরি। হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার আমার দু' কাঁধ ধরে বললেন— তুমি দুনিয়াতে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী।

আর 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও।[১৫]

দুনিয়ায় মু'মিনকে শরিয়তের বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করতে হয়। তা মু'মিনের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্র বা শস্যক্ষেত্রের মতো। এর সুফল মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য সংরক্ষিত থাকে। তাই পার্থিব জীবনে মু'মিনরা যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে চলতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে,

﴿الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ﴾

"যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কাজে উত্তম, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"[১৬]

দুনিয়ায় নানাভাবে পরীক্ষা : নানা সময়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নানা উপায়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ ۙ الَّذِیْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ﴾

"আর নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করব তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের অভাবের কোনো একটি দ্বারা। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন। যাদের উপর কোনো বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[১৭]

দুনিয়ায় কঠিন বিপদে পড়েন যাঁরা : যুগে যুগে নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ঠিক তেমনি সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ি এবং তাঁদের অনুসারীরাও কঠিন পরীক্ষায় পড়েছেন। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা ধৈর্য ধারণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন তাঁদের জন্য পরকালে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। তাই ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ

[১৪] *শরহ মুসলিম- ইমাম নববী, ১৮/৯৩।*
[১৫] *আহমাদ- হা. ৬৩৬৫; আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব- ৩/১৬।*
[১৬] *সূরা আল-মুলক : ২।*
[১৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৫-১৫৬।*

সূচীপত্র

بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন : নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহই থাকে না।[১৮]

কষ্টের বিনিময় : এমনকি আখিরাতের অফুরন্ত প্রতিদান দেখে দুনিয়ার বিপদমুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের জন্য আফসোস করবে।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) " يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) মানুষদের যখন প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন (পৃথিবীতে) বিপদমুক্ত মানুষেরা আকাঙ্খা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হত।[১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুসীবত দ্বারা।’[২০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোষাক বিলাসী ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়।’[২১]

অপরদিকে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে কোনো কাজ ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত নয়। ইচ্ছেমতো জীবন যাপন করতে পারবে। জান্নাতিদের কোনো ইচ্ছে অপূর্ণ থাকবে না। সর্বত্র সুখ আর সুখ। জান্নাতের আরাম আয়েশ ছেড়ে জান্নাতিগণ কখনো বাইরে যেতে চাইবে না। কোটি কোটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কোনো জান্নাতবাসী হাঁফিয়ে উঠবে না।

যদিও দুনিয়া কখনো জান্নাতের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। তবুও পৃথিবীকে কাফিরদের জান্নাত বলার অর্থ হচ্ছে কাফিররা দুনিয়াকে জান্নাত মনে করে। তারা তাদের জীবনকে আল্লাহপ্রদত্ত সীমার বাইরে থেকে ভোগ করতে চায়। তারা দুনিয়ার জীবনকে উপভোগ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পথ অবলম্বন করে থাকে। প্রবৃত্তির হুকুম ও চাহিদা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তারা আখিরাতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও উপভোগ্য করার জন্য জীবনপাত করে। অথচ একদিন তাকে এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে খালি হাতে মুসাফিরের মতো বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। বন্দীগণ যেমন বন্দিশালাকে নিজের গৃহ মনে করে না, নিজ গৃহে ফেরার জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকে। তেমনি মু’মিনগণ পৃথিবীকে আবাসস্থল মনে করে না। তাই দুনিয়ার জীবনে আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের মোহ তার থাকে না; বরং তার মন চির সুখের জান্নাতে যেতে ব্যাকুল থাকে। এ জন্য সে তা লাভ করার জন্য কঠিন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে এবং সকল বিপদ আপদ দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

শিক্ষাসমূহ

১. দুনিয়ার সুখ আসল ও চিরস্থায়ী নয়।

২. পৃথিবী মানুষের স্থায়ী নিবাস নয় সাময়িক পরীক্ষাকেন্দ্র মাত্র। ☒

---

[১৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯৮।*
[১৯] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৪০২।*
[২০] *সহীহুল বুখারী; মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১৬০।*
[২১] *সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১৬১।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

উপদেশ প্রদানের আদব ও শর্তসমূহ

-হোসাইন মঈন*

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা কোনো গোষ্ঠীর কী করা উচিত বা কী করণীয় অথবা কীভাবে আচরণ করা উচিত বা উচিত নয় সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে মতামত দেওয়া বা অনুরোধ করাই হচ্ছে উপদেশ। কাউকে কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা শিক্ষা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী চলা, কাজ করা বা 'আমল করার নির্দেশ দেওয়াও উপদেশের অন্তর্ভুক্ত। উপদেশ-এর সমার্থক শব্দগুলো হচ্ছে পরামর্শ, শিক্ষা, মন্ত্রণা, অনুশাসন, সুপারিশ ইত্যাদি। প্রতিদিনই আমরা কেউ না কেউ কাউকে না কাউকে কম-বেশি উপদেশ দিয়ে থাকি, অন্যের সমালোচনা করে থাকি। অন্য কোনো বিষয়ে আমাদের উদারতা থাক বা না থাক, অন্যের সমালোচনা করা বা উপদেশ প্রদানে আমাদের কোনো কার্পণ্য থাকে না। কিন্তু সমস্যা হলো– কোনো ব্যক্তি, পরিবার কিংবা গোষ্ঠীকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সিংহভাগ সময়ই আমরা তার প্রতি আবেগ, দয়া, ভালোবাসা কিংবা সহানুভূতির মতো ব্যাপারগুলো পাশ কাটিয়ে যাই; তার অনুভূতিকে ছোট করে ফেলি, তাকে বোকা কিংবা সে নির্বোধ এটা বোঝানোর চেষ্টা করি, এমনকি কখনো কখনো নিজেকে তার চেয়ে জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান হিসেবে কায়েম করার পায়তারা করি। এর চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, যে লোক বা পরিবারটা ভুল করেছে বা ভুল পথে চলছে, কোনো রাখঢাক না রেখে সমালোচনা করা কিংবা উপদেশ দিতে গিয়ে আমরা তার মাথার উপর রূঢ়তার বোমা ছুঁড়ে এমনভাবে শুরু করি, যেন ফাঁসির রশিতে লটকানোর মতো শাস্তিযোগ্য কোনো ভয়ংকর অপরাধ সে বা তারা করে ফেলেছে। এ দেশের খ্যাতিমান লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন বলেছেন, 'কেউ ভুল করছে বা ভুলভাবে চলছে দেখলে মুখ বুঝে না থেকে তাকে শুধরে দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু 'তোমার ভালোর জন্যই বলছি' –এই জাতীয় কথা দ্বারা উপদেশ দেওয়া বা সমালোচনার নামে আমরা মানুষকে যা বলি, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সেটা মোটেও তার ভালোর জন্যে বলি না; বলি তার দোষ দেখিয়ে তাকে খাটো করে নিজেকে বড় প্রমাণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্যে; অন্যের ঘাড়ে চড়ে আমাদের আত্মপ্রেম বৃদ্ধি করবার জন্য। মূলত কারো ছিদ্রান্বেষণ করে, টিটকারি মেরে, কাউকে দুঃখ দিয়ে, কাউকে ছোট করে কঠিন বা রূঢ় ভাষায় মিছরির ছুরি দিয়ে কুঁচি কুঁচি করে ফেলার নাম সমালোচনা বা উপদেশ নয়।'

আসলে বর্তমান সমাজে সমালোচনার নামে অহর্নিশ যে বিদ্রুপাত্মক ও আক্রমণাত্মক দোষ চর্চা হয়, তা বানোয়াট অপবাদ আরোপ ছাড়া কিছুই নয়। বুঝতে হবে যে, সমালোচনা বা উপদেশ এবং গীবতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সমালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়। এটি শুধু একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং সমাজের নৈতিকতা ও মানসিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমালোচনা যদি গঠনমূলক ও কল্যাণকামী না হয় তবে তা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। সমালোচনা হলো, কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে নির্মাণমূলকভাবে বিশ্লেষণ করা, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে উন্নতি বা ভালো করার জন্য পরামর্শ দেওয়া, যাতে কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী সাহায্য পায় বা সঠিক পথে চলে। এতে সাধারণত তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিযুক্ত আলোচনা করা হয় এবং সেটা হয় গঠনমূলকভাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্যই হবে ভুল সংশোধন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তা ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। ইসলামী দাঈ'গণ বলেন, 'কাউকে তার ব্যক্তিজীবনের পরিশুদ্ধি ও 'আক্বিদাহ্-বিশ্বাসের সংশোধন এবং ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলনের জন্য সংশোধন করা কিংবা সঠিক পথ দেখানোর জন্য উপদেশ দেওয়াটা দোষের কিছু নয়; বরং উপদেশ দেওয়া কল্যাণের কাজ, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। উপদেশ হচ্ছে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি আলামত, এটি পূর্ণ ঈমান ও পরিপূর্ণ ইহসান শ্রেণির গুণ। কিন্তু মানুষের উপস্থিতিতে বা প্রকাশ্যে কাউকে উপদেশ প্রদান বা সমালোচনা করা অনুচিত কাজ; ইসলাম কোনোভাবেই এমন আচরণ সমর্থন করে না, এটা অশোভনীয়, গুনাহগার হওয়ার কারণ। তা যদি অতিথিদের সামনে স্বামী বা স্ত্রী বা ছেলে-মেয়েদের ভদ্রতা, বিনয় বা আচার-আচরণ সম্পর্কেও হয় সে ক্ষেত্রেও। উপদেশ দিতে হবে গোপনে। লোকসম্মুখে যদি কাউকে নরম করেও কিছু সমালোচনা করা হয়, সেটা তার পক্ষে হজম করা খুবই শক্ত হয়। যত মঙ্গল কামনা নিয়েই বলা হোক না কেন, সে এটাকে ধরে নেবে অপরের সামনে তাকে অপমান বা ছোট করা হচ্ছে হিসেবে, তখন এটা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়, মন খারাপের কারণ হয়ে ওঠে।'

* *লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ইসলামী লেখক। ছাপড়া মসজিদ রোড, আদি টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল-১৯০০।*

নিজেকে প্রশ্ন করুন, অন্যের উপস্থিতিতে আপনার দোষ কেউ ধরলে আপনি পছন্দ করেন কিনা?

আমরা কাউকে শুধরে দেব অবশ্যই, তবে আত্মপ্রসাদ লাভের খাতিরে কারো দোষ খুঁজতে যাব না। এমনভাবে করবো যাতে তার সত্যিই উপকার হয়, উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে ভালো কিছু করতে সাহায্য করা, পছন্দনীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করা আর অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত রাখা, তাকে গড়ে তোলা। মিষ্টি কথা, প্রশংসা বা সমর্থন মানুষে মানুষে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলে; উপদেশ এসব দিয়ে শুরু করতে হয়, নইলে যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, সে আত্মরক্ষার বর্ম পরে নেবে প্রথমেই, উপদেশ দাতার কোনো কথা বুঝতে চাইবে না। ব্যক্তিকে সমালোচনা না করে তার কাজ বা ব্যবহারের সমালোচনা করতে হয়। একটু বুদ্ধি খরচ করে তাকে উপদেশ গ্রহণ করার মুডে নিয়ে আসতে হয়। উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য যেন কাউকে দোষারোপ বা ভর্ৎসনা না করা হয়। মনে রাখতে হবে, মানুষ কঠিন ও রূঢ় স্বভাবের মানুষদের ভয়-ই করে শুধু, কেউ তাদেরকে মন থেকে পছন্দ করে না, তাদের সঙ্গ বা নৈকট্য এড়িয়ে চলে। ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সলফে সালেহীন যখন কাউকে উপদেশ দিতে চাইতেন তখন তারা তাকে গোপনে সদুপদেশ দিতেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে একান্তে উপদেশ দিয়েছে সেটাই নসীহা, আর যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সদুপদেশ দিয়েছে সে তাকে ভর্ৎসনা করেছে। তবে, প্রকাশ্যে উপদেশ দেওয়ার মধ্যে যদি কোনো অগ্রগণ্য কল্যাণ বা কল্যাণের দিক প্রবল থাকে তাহলে প্রকাশ্যে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা কোন ক্ষেত্রে? যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে বিদ'আত ও পাপকর্মের প্রসার ঘটায়, এ ধরনের লোককে প্রকাশ্যে উপদেশ দেওয়া শরিয়তসম্মত।

ফুযাইল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখে ও উপদেশ দেয়। আর পাপী লোক দোষ খুঁজে বেড়ায়, বেইজ্জত করে ও ভর্ৎসনা করে।'[১]

ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি তুমি উপদেশ দিতে চাও তাহলে গোপনে দাও, ইঙ্গিতে দাও, সরাসরি ও প্রকাশ্যে নয়। যদি সে ইঙ্গিত না বুঝে তাহলে সরাসরি উপদেশ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যদি তুমি এ দিকগুলো এড়িয়ে যাও তাহলে তুমি জালিম, তুমি হিতৈষী নও।'

উপদেশ প্রদানের আদব, শর্ত ও শিষ্টাচার হচ্ছে সবসময় নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয় ও কোমলতা বজায় রাখা এবং প্রতিনিয়ত আমাদের এই অভ্যাসের অনুশীলন করা উচিত। এর কোনো বিকল্প বা অন্যথা যে নেই তা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ বর্ণিত ওয়াহীতেই প্রতিয়মান হয়। আল্লাহ বলেন,

"(হে নবী!) তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।"[২] "আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা, সুন্দর ওয়াজ সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।"[৩] "তোমরা উভয়ে নম্র ভাষায় কথা বলো। হয়তো সে শিক্ষা গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।"[৪]

হাদীসে বর্ণিত আছে, 'কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করলে বা বিনীত হলে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।'[৫] 'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতানুযায়ী কোনো মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার বা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যেও তা ভালোবাসে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যেও তা অপছন্দ করে।'[৬]

আর এটাই হচ্ছে উপদেশ দেওয়ার প্রেরণা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আপনি তাদের উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মু'মিনের উপকারে আসবে।"[৭] "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূণ্যশীলতা ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো।"[৮] "সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ করো, আর তোমার ওপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ করো।"[৯]

হাদীসে এসেছে– 'যখন কোনো বান্দা নিজে ভালো কাজ করার পাশাপাশি অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তখন আল্লাহও ওই ব্যক্তির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখেন।'[১০]

বস্তুত, অন্যকে সদুপদেশ দেওয়াও সহযোগিতার প্রকারান্তর।

আবূ 'আম্র ইবনুস সালাহ বলেন, 'নসীহা বা উপদেশ হচ্ছে এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা উপদেশদাতার পক্ষ থেকে উপদেশ গ্রহীতার যাবতীয় উপায়ে সব ধরনের হিত কামনা ও হিত সাধনকে বুঝায়।'

---

[১] *জামেউল হিকাম- ১/২৩৬।*

[২] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৫৯।*
[৩] *সূরা আন্-নাহ্ল : ১২৫।*
[৪] *সূরা ত্ব-হা- : ৪৪।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৮৬।*
[৬] *আল জামিউ বাইনাস সাহীহাঈন- হা. ১৯১৪।*
[৭] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৫।*
[৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২।*
[৯] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৭।*
[১০] *সহীহ মুসলিম; সুনান আন্ নাসায়ী; জামে' আত্ তিরমিযী।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আবূ রুকাইয়াহ্ তামিম ইবনু আউস আদ্-দারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দ্বীন হলো সদুপদেশ বা কল্যাণ কামনা। তা আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানের নেতার ও সর্বসাধারণ মুসলিমের জন।'[১]

আজগুবি, অহেতুক কথাবার্তা, শুনতে রাসালো কোনো উদ্ভট কথা দ্বারা কাউকে উপদেশ দেওয়া যাবে না। নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লৌকিকতার আশ্রয় নেয়া, কৃত্রিম হাসি-কান্না বা ভাষাশৈলীর ব্যবহার করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ভাষার প্রাঞ্জলতা শিখে মানুষের অন্তরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোনো ফর্‌য ও নফল 'ইবাদত কবুল করবে না।'[২]

উপদেশদাতার দায়িত্ব হবে উপযুক্ত সময় নির্বাচন করে উপদেশ গ্রহীতার দোষ-ত্রুটিসমূহ লুকিয়ে রেখে সম্মানে আঘাত না করে সুন্দর ভাষা নির্বাচন করে তার সঙ্গে নরম ভাষা ব্যবহার করা। কেননা সবাইকে সমানভাবে সম্মান করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। হোক সে সাদা বা কালো, ধনী বা দরিদ্র, সবল বা দুর্বল। উপদেশ দেওয়ার আগে যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হতে হবে উপদেশ শ্রবণকারীর মাঝে যে দোষ নেই, তার উপর সে দোষ আরোপ করা হচ্ছে কি-না; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ধর্ম বিশারদগণ বলেন, 'উপদেশ দিতে হবে ইখলাসের সঙ্গে। কারণ, ইখলাসবিহীন কোনো 'আমল মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ- যাকে উপদেশ দেওয়া হবে তা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নিজের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখে দুনিয়ার কোনো পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়। ব্যক্তির প্রতি কোনো ক্ষোভ, ঘৃণা ও কু-ধারণা রেখে রূঢ় কণ্ঠে এবং মনে আঘাত করে কাউকে উপদেশ দেওয়া যাবে না। উপদেশ প্রদানে পবিত্র কুরআনের বাণী শোনানো উচিত, নবী-রাসূল ও আগের মুসলিম মনীষীদের ঘটনা বর্ণনা করা উচিত। উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে মূল কর্তব্য হবে মুখলিস বা আন্তরিক হওয়া, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। উপদেশ কোনো মুসলিম ভাইয়ের উপর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য হবে না। উপদেশ হতে হবে নির্ভেজাল ও খিয়ানতমুক্ত। উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য দোষারোপ বা ভর্ৎসনা করা নয়। কর্কশ ও কঠিন ভাষায় নয়, উপদেশ দিতে হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার চেতনা নিয়ে।'

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০৫।*
[২] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪১০।*

উপদেশ হতে হবে জ্ঞাননির্ভর, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তিভিত্তিক। শাইখ সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হিকমত হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে দা'ওয়াত দেওয়া; অজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণটি আগে শুরু করা, এরপর পরেরটি এবং মানুষের স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তির যেটা কাছাকাছি সেটা দিয়ে শুরু করা। যেটা মানুষ পুরোপুরি গ্রহণ করবে সেটা দিয়ে শুরু করা।'

আর একটা কথা, যখন আপনি নিজেই কোনো বিষয় নিয়ে হতাশ কিংবা রেগে আছেন, সে অবস্থায় কাউকে উপদেশ না দেওয়াই ভালো। আবার একজন ব্যক্তি, সে হয়তো তখন এমনিতেই একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর আপনি এর মধ্যে উপদেশ দেওয়ার মতো আরেকটি নতুন ব্যাপার নিয়ে এলেন, এমনটাও যেন না হয়। কেননা ওই সময়ে আপনার উপদেশ তার মনটাকে আরো ছোট করে দিতে পারে অথবা এমনও হতে পারে আপনার উপদেশ মেনে চলার জন্য সে প্রস্তুত নয়। উপদেশ প্রদানে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগ করা শ্রেয় এবং যে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, তা আগে নিজের মধ্যে অনুশীলন থাকা জরুরি।

আমরা অনেকেই আছি অন্যকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দেই ঠিকই, কিন্তু নিজে তা 'আমল করি না বা সে বিষয়ে বেমালুম। প্রকৃতপক্ষে নিজে 'আমল না করে অপরকে উপদেশ দেওয়া জায়িয হলেও তা নিন্দনীয়। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ছলনা হলো তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা শুনিয়ে আস্থা অর্জন করবে, কিন্তু তারা কখনো ভালো কাজ করবে না। বলা হয়ে থাকে, নিজে 'আমল না করে অপরকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া ইহুদি আলেম ও মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ব্যক্তিদের দা'ওয়াত ফলদায়ক নয়। আর এ শ্রেণির মানুষের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি রয়েছে। যারা এমনটা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমরা কি মানুষকে সৎ কার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো। তবে কি তোমরা বোঝ না?"[৩]

"তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরাই মেনে চলো না? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কিছুসংখ্যক জান্নাতবাসী অন্য কিছুসংখ্যক জাহান্নামবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কীভাবে জাহান্নামী হলে, অথচ আমরা তো

[৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৪।*
[৪] *সূরা স-ফ্ : ২-৩।*

সেসব কাজের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করেছি, যা তোমাদের কাছ থেকে শিখেছিলাম? জাহান্নামবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম, কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।'[১]

ইবনু হারেসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে; অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন অন্য জাহান্নামীরা তার সামনে একত্রিত হয়ে বলবে, ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে বাধা দিতে? তখন সে বলবে, আমি তোমাদেরকে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দিলেও নিজেই তা করতাম।'[২]

আবার মুসনাদে আহমাদ (হা. ১২২২১)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মি'রাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণির মানুষের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের জিহ্বাকে জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা হলো আপনার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তা, তারা যে সব ভালো কাজের আদেশ করতো, তা নিজেরা কখনো করতো না'।'

অথচ উপদেশ প্রদান করার বহুবিধ শর্তাবলির মধ্যে প্রধানতম শর্ত হলো নিজের মধ্যেও ওই 'আমল পালন বা গুণাবলিগুলো চলমান বা বলবৎ থাকা; অর্থাৎ- অন্যকে উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে নিজেও 'আমলের চেষ্টা করবে, অর্থাৎ- নিজেকেও সংশোধন করা আবশ্যক এবং তা জরুরিও বটে। কারণ, অনেক সময় অন্যকে বলার দ্বারা নিজেরও 'আমলের তাওফীক্ব হয়। তাছাড়া এটা হচ্ছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ ও সুন্নাত।

অন্যকে উপদেশ দিতে গিয়ে স্বগর্বে নিজের অপরাধসমূহ জনসম্মুখে প্রকাশ করে থাকে অনেকে। উদাহরণস্বরূপ 'আমি আগে বেনামাযী ছিলাম, অনেক অপকর্মও করে বেড়াতাম, এহেন কোনো কাজ নেই যা আমি করিনি। এখন সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি, এখন আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, আল্লাহবিল্লাহ করি...। আমি যদি পারি, তুমিও পারবে। আমি যদি ভদ্র হতে পারি, তুমি কেন পারবে না? আমি তো আগে তোমার থেকেও বেশি অভদ্র ছিলাম।'... ইত্যাদি। তারা মনে করে যে, এতে করে তারা মুখলিস বা খাঁটি মানুষ হিসেবে গণ্য হবে। এটিও একটি ভুল ধারণা। মূলত নিজের পাপের কথা বলে বেড়ানো মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত; এটা কোনো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সব সময় সব কথা সব জায়গায় বলে বেড়াতে হয় না; নিজের গুনাহের কথা তো একদমই নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা গুনাহ প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। গুনাহ করার পর কোনো ব্যক্তি যদি তা প্রকাশ করে তাহলে সেটা আর সগিরা গুনাহ থাকে না, তা কবিরা গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে গুনাহের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার সব উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী এর ব্যতিক্রম। আর নিশ্চয়ই এটা বড়ই অন্যায় যে, কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা অপরাধ করলো, যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে বলে বেড়াতে লাগলো, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটালো যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল।'[৩]

উপদেশদাতার মতো উপদেশ গ্রহণকারীর জন্যও অবশ্য পালনীয় কিছু আদব বা শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপনাভ্যন্তরের অহম ঝেড়ে ফেলা, যথাসম্ভব নম্র থাকার চেষ্টা করা। সর্বোপরি মনে রাখা জরুরি যে, উপদেশ মানেই আক্রমণ নয়। উপদেশদাতা যা বলছে বা বলতে চায় তা সঠিকভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে আরো ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যয়ী হওয়া উচিত। উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে মনখোলা থাকা উচিত এইজন্য যে, যিনি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন হয়তো তিনি এমন কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারেন, যে বিষয়ে আপনি আগে কখনোই ভাবেননি, হয়তো সেটা আপনার মনের মধ্যে নতুন কোনো ভাবনারও জন্ম দিতে পারে। যে আপনার ভালোর জন্য চেষ্টা বা সাহায্য করে তাকে মূল্যায়ন করতে হবে। মনে রাখা জরুরি, আপনার ভুলের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত যে সতর্ক করে সেই প্রকৃত বা আসল বন্ধু; আর যে আপনাকে অনবরত ভুলের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখলেও এড়িয়ে যায় সে বন্ধু নয়। সব উপদেশ আপনাকে মেনে চলতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারো উপদেশ গ্রহণ না করলেও উপদেশদাতাকে ধন্যবাদ বলা এবং তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন —আমিন। ☒

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৬৭।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৯৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৮৯; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২১২৭৭, ২১২৮৭, ২১২৯৩, ২১৩১২।*

[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৬৯।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সভ্যতার বিকাশ

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন★

সভ্যতা মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ফল। এটি শুধুমাত্র মানব জীবনের শারীরিক চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানসিক, নৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আধ্যাত্মিক দিকেরও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সভ্যতা হলো মানব ইতিহাসের ধারাবাহিক বিকাশের প্রতিফলন, যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে।

মানুষ যখন প্রথম গুহায় বসতি গড়ে তোলে, তখন তার কেবল বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল। খাদ্য, নিরাপত্তা এবং আশ্রয় –এই তিনটি প্রাথমিক চাহিদাই তার জীবনকে পরিচালিত করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরের গভীরে বিকাশের আগ্রহ জাগে। তিনি শুধু বাঁচতে চাননি, তিনি বুঝতে চেয়েছেন, কিভাবে সমাজকে সুসংগঠিত করা যায়, কিভাবে জীবনকে সুন্দর, নিরাপদ এবং অর্থপূর্ণ করা যায়। এই আগ্রহ থেকেই সভ্যতার বীজ জন্মায়।

★ **সভ্যতা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো–** মানব সমাজের এমন একটি অবস্থা, যেখানে মানুষ কেবল বেঁচে থাকে না; বরং তার জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। ইবনু খালদুন বলেন,

“সভ্যতা হলো মানুষের বুদ্ধি, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সংহতির ফল। এটি মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করে।”

সামাজিক ও নৈতিক সংহতি সভ্যতার মূল ভিত্তি।

প্রথমে সভ্যতা মানুষকে শৃঙ্খলা শেখায়। ছোট ছোট গোষ্ঠী থেকে বড় বড় সম্প্রদায় গঠিত হয়। নিয়ম, আইন এবং সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের দিকে পরিচালিত করে। মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন মিশরের নগর পরিকল্পনা, আইন এবং প্রশাসনিক কাঠামো প্রমাণ করে যে সভ্যতা কেবল বসতি নয়, এটি মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উদ্ভাবনী করে। সভ্যতা মানুষের জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতাকে প্রসারিত করে। গ্রিস ও রোমান সভ্যতা দর্শন, গণিত এবং সাহিত্যকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। ইসলামিক সভ্যতা চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দার্শনিক চিন্তায় যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। প্রতিটি সভ্যতা মানুষের কল্পনাশক্তি, শিক্ষাগত চিন্তা এবং সৃজনশীলতার বিকাশে অবদান রেখেছে। অর্থনীতি ও প্রযুক্তি সভ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষ কৃষি আবিষ্কার করে, নদীর তীরের পাশে নগর স্থাপন করে এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। চীনের সেচ ব্যবস্থা, সিন্ধু সভ্যতার শহর পরিকল্পনা এবং মিশরের কৃষি কৌশল দেখায় কিভাবে সভ্যতা মানুষের জীবনকে সহজ ও নিরাপদ করেছে। প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক দক্ষতার বিকাশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নে অবদান রেখেছে। রাজনীতি ও প্রশাসনের মাধ্যমে সভ্যতা মানুষকে সামাজিক একতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করেছে। রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য ও মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস দেখায়, সুসংগঠিত প্রশাসন মানুষকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত জীবন দিতে পারে। সভ্যতা মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব, দায়িত্ব এবং সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করেছে। সংগীত, সাহিত্য, স্থাপত্য এবং শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীলতা প্রসারিত হয়েছে। সভ্যতা মানুষকে কেবল বাঁচার দক্ষতা নয়; বরং সুন্দর জীবন যাপনের কৌশলও শিখিয়েছে। প্রতিটি যুগের সভ্যতা মানবতার মান বৃদ্ধি করেছে, মনুষ্যত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীকে জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার আলোয় আলোকিত করেছে। মানব ইতিহাস প্রমাণ করে যে সভ্যতা মানুষকে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয়; বরং মানসিক, নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিকশিত করেছে। সভ্যতার মাধ্যমে মানুষ নিজের অন্তর, মন এবং জীবনকে পরিপূর্ণ করতে

★ অধ্যায়নরত, মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

পেরেছে। সভ্যতা না থাকলে আমাদের দুনিয়া আজকের চেয়ে অনেক অন্ধকার ও অগণ্য হত। তাই সভ্যতা মানবজীবনের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি এবং পৃথিবীর বিকাশের স্থায়ী স্তম্ভ।

★ **পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ–** পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো মেসোপটেমীয় সভ্যতা, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা এবং চীনা সভ্যতা। এছাড়াও মিনোয়ান, মায়া, অ্যাজটেক ও ইনকা সভ্যতা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন এই সভ্যতাগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও অবদানের জন্য বিখ্যাত ছিল। নিচে এদের কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

মেসোপটেমীয় সভ্যতা : এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় এই চারটি প্রধান সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা : নীলনদের তীরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা স্থাপত্য, বিজ্ঞান এবং ধর্মের জন্য পরিচিত ছিল। পিরামিড, মমি তৈরি এবং Hieroglyphic লিপি তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

সিন্ধু সভ্যতা : এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা, যা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নামক দু'টি প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। উন্নত নগর পরিকল্পনা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত ছিল এই সভ্যতা।

চীনা সভ্যতা : হোয়াংহো নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতাও প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মায়া সভ্যতা : মধ্য আমেরিকায় গড়ে ওঠা এই সভ্যতা জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং তাদের নিজস্ব লিপি ও ক্যালেন্ডারের জন্য পরিচিত ছিল।

রোমান সভ্যতা : রোমান সভ্যতা (Roman civilization) বলতে প্রাচীন ইতালির রোম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি প্রভাবশালী সভ্যতাকে বোঝায়। এটি প্রায় ১০০০ বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশাল প্রভাব ফেলেছে। এই সভ্যতাটি রাজনৈতিক, সামরিক, স্থাপত্য, আইন, সাহিত্য এবং প্রকৌশলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। প্রাচীন রোম একটি ছোট বসতি থেকে ধীরে ধীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তার ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া পর্যন্ত। রোমানরা তাদের সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং আইন প্রণয়নের জন্য সুপরিচিত ছিল। তারা একটি শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র থেকে একটি সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তাদের স্থাপত্য ও প্রকৌশল আজও আধুনিক বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণা।

পারস্য সভ্যতা : প্রাচীন পারস্য (বর্তমান ইরান) ছিল একটি প্রভাবশালী সভ্যতা, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৯ অব্দ থেকে ৩৩১ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এটি আকিমেনিড সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য তার স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং সামরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল।

ব্যবলনীয় সভ্যতা : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছিল মেসোপটেমিয়ার একটি প্রাচীন সভ্যতা, যা বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯৪ অব্দে অ্যামোরাইট নামক একটি জাতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি মেসোপটেমিয়ার সুমের ও আক্কাদ নগরীর কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ব্যাবিলন শহরটিই ছিল এই সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু, যার নামকরণ করা হয়েছিল "দেবতার নগরী"। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা তার স্থাপত্য, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে উন্নতির জন্য বিখ্যাত ছিল।

মধ্যযুগীয় সভ্যতা : মধ্যযুগীয় সভ্যতা বলতে সাধারণত ইউরোপের ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময়কালকে বোঝানো হয়, যা ৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এর সূচনা হয়। এই সময়কে অনেকে "অন্ধকার যুগ"-ও বলে থাকেন, কারণ এটি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, আক্রমণ এবং মহামারীর যুগ। তবে, এই সময়টি শুধু অন্ধকার ছিল না। এটি ছিল নতুন সভ্যতা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের বিকাশের

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সময়। মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শনের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছিল, যাকে "ইসলামী স্বর্ণযুগ" বলা হয়। এটি মূলত ৮ম থেকে ১৪শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যখন ইউরোপে অনেক ইতিহাসবিদ "অন্ধকার যুগ" বলে মনে করেন। এই সময়ে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞানচর্চার এক বিশাল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

ইসলামী সভ্যতা : ইসলামী সভ্যতার দ্রুত বিকাশের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। যথা-

★ **ইসলামের মৌলিক শিক্ষা :** ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কুরআন ও হাদীসে বারবার জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে, যা মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে নতুন কিছু শেখা ও আবিষ্কার করার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল।

★ **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও একতা :** প্রাথমিক মুসলিম শাসকরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে, যা বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করে তোলে এবং জ্ঞান ও বাণিজ্যের অবাধ আদান-প্রদান নিশ্চিত করে।

★ **জ্ঞানের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা :** 'উমাইয়াহ্ ও 'আব্বাসীয় খলিফারা জ্ঞানচর্চাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করতেন। তারা বাগদাদের মতো শহরে "বায়তুল হিকমাহ" (House of Wisdom)-এর মতো বিশাল লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখানে পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রিক, রোমান, ভারতীয় ও ফারসি ভাষায় লেখা বই আরবিতে অনুবাদ করতেন।

★ **বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন :** মুসলিমরা এমন সব অঞ্চল জয় করেছিলেন, যেখানে আগে থেকেই উন্নত সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, যেমন- রোমান, পারস্য, বাইজেন্টাইন এবং ভারতীয় সভ্যতা। মুসলিমরা এই সভ্যতাগুলোর জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করে সেগুলোকে আরো উন্নত করে তোলেন।

★ **সাধারণ ভাষা :** আরবি ভাষা ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের সাধারণ ভাষা। এর ফলে পণ্ডিতরা একে অপরের সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারতেন, যা জ্ঞানের দ্রুত প্রসারে সাহায্য করে।

ইনকা সভ্যতা : ইনকা সভ্যতা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা অঞ্চলে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন সভ্যতা। এটি ১৪০০ থেকে ১৫৩৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল কুসকো। ইনকা সাম্রাজ্য "তাহুয়ান্তিন Suyo" নামে পরিচিত ছিল, যার অর্থ "চারটি অংশের ভূমি"। ইনকা স্থাপত্য, বিশেষ করে মাচু পিচু।

আফ্রিকান সভ্যতা : আফ্রিকা মহাদেশেও মধ্যযুগে বেশ কিছু শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যেমন- ঘানা, মালি এবং সংহাই সাম্রাজ্য। বাণিজ্য, এই সাম্রাজ্যগুলো ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্যের মাধ্যমে সোনা, লবণ এবং অন্যান্য মূল্যবান পণ্যের ব্যবসা করত। এই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মালির বিখ্যাত শহর তিম্বাকতু ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে বহু লাইব্রেরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

এই সভ্যতাগুলো প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগ ছিল একটি বৈচিত্র্যময় এবং গতিশীল সময়কাল, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নিজেদের মতো করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।

আধুনিক যুগে সভ্যতা : আধুনিক যুগ বা আধুনিক সভ্যতা কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা ঘটনা দিয়ে শুরু হয়নি। এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যা মূলত রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতাকে বোঝার জন্য এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরায়ন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একে অতীতের সভ্যতাগুলো থেকে আলাদা করেছে। **বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–**

★ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ :** আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, কম্পিউটার এবং এখনকার ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নতি মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

দিয়েছে। যেমন- শিল্প বিপ্লব (১৭৬০-১৮৪০) মানব ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা যান্ত্রিক হয়ে যায়। এরপর বিংশ শতাব্দীর ইলেকট্রনিক্স এবং বর্তমানের ডিজিটাল বিপ্লব (Digital Revolution) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

★ নগরায়ন (Urbanization) : আধুনিক যুগে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করেছে। শহরগুলো শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নগরায়নের ফলে সামাজিক কাঠামো, জীবনযাত্রা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে।

যেমন- ১৯০০ সালের দিকে বিশ্বের মাত্র ১৩% মানুষ শহরে বাস করত। বর্তমানে এই সংখ্যা ৫০%-এর বেশি। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০50 সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৬৮% মানুষ শহরে বসবাস করবে। এই পরিসংখ্যান নগরায়নের ব্যাপকতাকে প্রমাণ করে।

★ বিশ্বায়ন (Globalization) : প্রযুক্তির উন্নতির কারণে বিশ্ব এখন একটি "বৈশ্বিক গ্রাম"-এ পরিণত হয়েছে। পণ্য, তথ্য, সংস্কৃতি এবং ধারণা খুব দ্রুত এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন- ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক, টুইটার) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। কোনো একটি দেশের একটি ঘটনা এখন মুহূর্তের মধ্যেই পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

★ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার : আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিগত অধিকার, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ধারণার প্রসার ঘটেছে। যদিও এর চর্চা সব দেশে একরকম নয়, কিন্তু এটি আধুনিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। যেমন- অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এবং আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬) ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারণাকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) আধুনিক সভ্যতার এই আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

★ আধুনিক সভ্যতা চ্যালেঞ্জ : আধুনিক সভ্যতা যেমন অনেক সুবিধা এনেছে, তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। যেমন- পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান বিশ্বকে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَابۡتَغِ فِيۡمَاۤ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الۡاٰخِرَةَ وَلَا تَنۡسَ نَصِيۡبَكَ مِنَ الدُّنۡيَا وَاَحۡسِنۡ كَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ وَلَا تَبۡغِ الۡفَسَادَ فِى الۡاَرۡضِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡمُفۡسِدِيۡنَ﴾

অর্থ : "আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। আর তুমি সৎকাজ করো, যেমন- আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।"[১]

সভ্যতা মানবজাতির সর্বোচ্চ সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচায়ক। প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে সভ্যতার অপরিসীম অবদান রয়েছে। সভ্যতা শুধু মানুষকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংহত করে না; বরং তার চিন্তাভাবনা, মানসিকতা ও নৈতিক দিকও সমৃদ্ধ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সভ্যতা যত বেশি উন্নত হয়েছে, মানুষের জীবনের মান এবং সমাজের স্থায়িত্বও তত বেশি উন্নত হয়েছে। তাই পৃথিবীর বিকাশকে বোঝার জন্য সভ্যতার অধ্যয়ন অপরিহার্য এবং এটি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি মর্মস্পর্শী দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সভ্যতার শিক্ষা থেকে আমরা শিখতে পারি কিভাবে প্রযুক্তি, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ, স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা যায়। ☒

---

[১] *সূরা আল ক্বাসাস : ৭৭।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ইসকনের বর্বরতা, ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

–তানযীল আহমাদ*

এক. গত ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বিগত পনেরো বছরের ফ্যাসিস্ট, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেবাদাস আওয়ামী রেজিমের পতন হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট এবং তার প্রভু ভারত নিত্য-নতুন অপকৌশল করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। ইসকন নামে একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভারতের মদদে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম মেয়েদের টার্গেট করে ইসকন সন্ত্রাসীরা ভাগওয়া লাভ ট্রাপ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মেতে উঠেছে। ভাগওয়া লাভ ট্রাপ হলো, *প্রথমত*, মুসলিম মেয়েদেরকে কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরীক সম্পর্ক স্থাপন করা, *দ্বিতীয়ত*, মুসলিম সেজে তাদেরকে বিয়ে করে ভারতের পতিতালয়ে বিক্রি করা, *তৃতীয়ত*, মুসলিম মেয়েদেরকে ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা, *চতুর্থত*, সেসব মেয়েদের দিয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের তদবির করা। মোটকথা মুসলিম পরিবারকে চারিত্রিকভাবে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়নে তারা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাইলের পালিত মোসাদের প্রশিক্ষিত স্পাইরা যেভাবে মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের টার্গেট করে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে শেষ করে দেয়, ঠিক তেমনি ভারতের 'র' এবং ইসকন তাদের পালিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। পরিতাপের বিষয় হলো অনেক মুসলিম মেয়ে এমনকি পর্দাশীল মেয়েরাও তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। আরো সহজ করে বলা যায়, ইসকন চায় বিজেপির অখণ্ড ভারতের গোপন প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে; যা তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি গাজীপুরের মাওলানা আতাউল্লাহ বিক্রমপুরীকে সরাসরি ভারত থেকে নাম পরিচয়হীন এক ব্যক্তি ফোন দিয়ে হত্যার হুমকি দিয়েছে ইসকনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গাজীপুর টঙ্গীর একজন বয়োবৃদ্ধ ইমাম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহকে অপহরণ করে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে ইসকন সন্ত্রাসীরা। এর আগেও সিলেটের এক মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমানকে তারা হত্যা করে। এই সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেককে হত্যার হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এমন এক ভীতিকর পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করতে চায় যা আমরা কেউ ভাবছিই না। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ইসকনের সন্ত্রাসীরা সাইফুল হক আলিফ নামক এক আইনজীবীকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র করে– যা গোটা জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের একটি সভায় চিন্ময় কৃষ্ণ বাংলাদেশের পতাকাকে অবমাননা করে এবং দেশবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়। এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম আদালতে মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। অতঃপর গত ২৫ নভেম্বর এয়ারপোর্ট থেকে চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২৬ নভেম্বর আদালতে তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর হলে ইসকনের সন্ত্রাসীরা বর্বরতা চালায় আদালত প্রাঙ্গণে। একপর্যায়ে সাইফুল হক আলিফ নামক একজন আইনজীবীকে জবাই বরে হত্যা করে তারা। প্রকাশ্য দিবালোকে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। আরো আশঙ্কার বিষয় হলো, চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের পরপরই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চিন্ময়কে জামিন দেয়া না হলে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সেখানের মুসলিমদের তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। তার এই বক্তব্যের পরদিনই চট্টগ্রামে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ- শুভেন্দুর উস্কানিমূলক বক্তব্যই চট্টগ্রামের ইসকনকে সাহস যুগিয়েছে। পর কথা হলো– অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারত কি এভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটা কেমন পররাষ্ট্রনীতি! মূলত বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ভারতকে এমন অধিকার দিয়ে নিজের গদি টিকিয়ে রেখেছে। দেশকে বিক্রি করে,

* *সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আওয়ামী রেজিম ফায়দা নিয়েছে। ফলে ভারত চেষ্টা করে যাচ্ছে তার একান্ত অনুগত সেবাদাসকে আবারো ফিরিয়ে আনতে। আর ভারতের 'র' এবং ইসকন এটা বুঝতে পারে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চায় নারায়ে তাকবীরের পরিবর্তে জয় শ্রীরামের শ্লোগান প্রতিষ্ঠা করতে, বাংলার মুসলিমদের পায়ে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে, সর্বোপরি, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করাই হলো তারাই মূখ্য উদ্দেশ্য।

দুই. গত ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে চট্টগ্রাম নগরীর কয়েকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে 'ইসকন' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে 'ফুড ফর লাইফ' কর্মসূচির আড়ালে সপ্তাহব্যাপী খাবার বিতরণ করা হয়। হিন্দু সংগঠন 'ইসকন' খাবার বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ধর্মীয় মন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে বলে। কোমলমতী শিক্ষার্থীরা না বুঝেই তা উচ্চারণ করে তাদের ধর্মীয় প্রসাদ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলিম জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ মিছিল বের করে। কিন্তু কার্যতঃ এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলে দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলতে বুঝায় সেই রাষ্ট্রকে, যা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিধানকে প্রয়োগ করে না, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে না, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে না। সকল নাগরিক ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। কোনো ধর্মপ্রচারক অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীকে প্রলোভন দেখিয়ে, জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্ট লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য– **(ক)** সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, **(খ)** রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, **(গ)** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, **(ঘ)** কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে। কিন্তু হিন্দু সংগঠন 'ইসকন'-এর কর্মীরা কোমলমতি মুসলিম শিশুদেরকে খাবার বিতরণের নাম করে প্রসাদ খাইয়ে নিজেদের ধর্মীয় মন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' পাঠ করানোর ঘটনা কি ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়? তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড কি সংবিধানবিরোধী নয়?

'ইসকন' কী?

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ একটি হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে ISKON-এর পূর্ণরূপ International Society For Krishna Conciousness। এর প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দের জন্ম কলকাতায় ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ সালে। মৃত্যু ১৪ নভেম্বর ১৯৮৭। ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৬ সালে ইসকন প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা ও ইউরোপে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এতে তিনি সফলও হন। ইউরোপ আমেরিকার অনেক যুবক-যুবতী তার সাহচর্যে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে ইসকনের সদস্যপদ লাভ করে। ইসকনের সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসকনের ৫০,০০০টিরও বেশি মন্দির এবং কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি বিদ্যালয় ও ৯০টি ভোজনালয়ও রয়েছে। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপ ও ভারতে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকা'র স্বামীবাগে ইসকনের মূল কার্যালয়। যেখানে তাদের কয়েকটি মন্দির রয়েছে। প্রতি বছর তারা ৭ দিনব্যাপী রথযাত্রা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সব জায়গাতে রথযাত্রা সাধারণতঃ এক দিনের হয়ে থাকে। দুপুরে শুরু হয়ে বিকালে শেষ হয়। কিন্তু ৭ দিনের হলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই রথযাত্রার আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এর যথার্থতা আমরা পাই ইসকনের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ঘাটলে। স্বামী প্রভুপাদ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও লেখাপড়া করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি চালায় খ্রিষ্টানরা, স্বামী প্রভুপাদ পেশায় ছিলেন ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসায়ী। ১৯৬৫ সালের দিকে তিনি স্থায়ীভাবে আমেরিকা চলে যান এবং ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল কথা হলো, তারা শুধু কৃষ্ণের পূজা করবে, অন্য দেবতাদের নয়। অথচ হিন্দু ধর্ম প্রধান তিন দেবতা নির্ভর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। হিন্দু ধর্ম কখনোই কৃষ্ণ নির্ভর ধর্ম নয়। এ জন্যই মূল ধর্মের হিন্দুরা স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনকে বাধা দেয়। সে সময় স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনের পাশে এসে দাঁড়ায় জেঃ স্টিলসন জজ হারভে কক্স, ল্যারি

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো বড় বড় ইয়াহূদী খ্রিষ্টানরা। অনেকেই ইসকনকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের একটি শাখা মনে করে থাকে। অবশ্য এর যথেষ্ট কারণও আছে। যেমন- ইসকনের মন্দিরের প্রধানরা বিয়ে করতে পারবে না। যেমনটি খ্রিষ্টানদের গির্জার ফাদাররা বিয়ে করতে পারে না। অথচ হিন্দুদের পুরোহিতরা বিয়ে-শাদী সবই করতে পারে। এদিক দিয়ে খ্রিষ্টানদের সাথে ইসকনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ইসকন কিন্তু নিজেই মন্দির তৈরি করে না; বরং সনাতন হিন্দুদের মন্দির জবর-দখল করে সেখানে তাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম চালায়। যেমন- ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর ইসকন কর্তৃক ঠাকুরগাঁওয়ের আউলিয়াপুর গ্রামের শ্রী শ্রী রশিক রায় জিউ মন্দির দখলের প্রতিবাদে ইসকনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ করে সনাতন ধর্মের হিন্দুরা। পুরান ঢাকার স্বামীবাগে ইসকনের যে মন্দির আছে, যেখানে আগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির ছিল। মূল ধারার হিন্দুদের থেকে চক্রান্ত করে দখল করে ইসকন সেখানে তাদের বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছে।

‘বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা– “বাংলাদেশে’র” নামক বইয়ে উল্লেখ আছে, ‘ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দপ্তর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলতঃ এটা ইহূদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।[১]

বাংলাদেশে ইসকনের কিছু উস্কানিমূলক ও সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড

১. ২০১২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে সনাতন এক হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। পঞ্চগড়েও মূল ধারার হিন্দুদেরকে পিটিয়েছে তারা। ঢাকার স্বামীবাগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির দখল।

২. সিলেটের জগন্নাথপুরের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন নেতা মিন্টু ধর।

৩. স্বামীবাগে মসজিদের তারাবী বন্ধ করে দিয়েছিল ইসকন। নামাযের সময় গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে তারাবীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়।

৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরি করে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু বেদান্ত ইত্যাদি। বর্তমানে অনলাইনে যে ধর্ম অবমাননা করা হয় তার ৯০% করে ইসকন সদস্যরা।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে চাকরিতে প্রচুর হিন্দু প্রবেশের অন্যতম কারণ- ইসকন হিন্দুদের চাকরিতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

৬. সম্প্রতি চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্কুলে প্রসাদ বিতরণ করে মুসলিম শিশুদেরকে তাদের মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ পাঠ করায়।

এখানেই নয়, তাদের আরো দাবি হলো– সংসদে হিন্দুদের ৬০টি সংরক্ষিত আসন, উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

সুতরাং ইসকন মোটেও সাধারণ কোনো সংগঠন নয়। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সরকারের উচিৎ উগ্রতা ছড়িয়ে দেয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা, দেশের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী রেজিমকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরানোর অপতৎপরতা রোধে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা। দেশের নিরাপত্তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত জরুরি। কথিত ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠিগুলোকে যদি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে ইসকনকে কেনো নিষিদ্ধ করা হবে না?

তিন. গত ২০১৯ সালের ১৬ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের সাথে হোয়াইট হাউজে কথা বলেন। মার্কিন টিভি চ্যানেল এবিসি নেটওয়ার্কের এবিসি ফোর সেই সংবাদ ভিডিওসহ প্রচার করে। বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও ধর্মের প্রায় ২৭ জন প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করেন। তারা হলেন : নিউজিল্যান্ড, কিউবা, ইরিত্রিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, সুদান, ভিয়েতনাম, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, জিনজিয়ান, উত্তর কোরিয়া, তিব্বত, চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, জার্মানীর খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শী‘আ, কাদিয়ানী, হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিগণ। তারা তাদের অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সন্ত্রাসবাদের! বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশংসা করেন।

এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়া সাহা নামের এক মহিলা। যিনি ‘বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ’ এর সাংগঠনিক সেক্রেটারী। প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও

[১] *বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা– বাংলাদেশে র’- পৃ. ১৭১।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

খ্রিষ্টান নিখোঁজ রয়েছেন। দয়া করে আমাদের লোকজনকে সহায়তা করুন, আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই।

এরপর তিনি বলেন, এখন সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু রয়েছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর খুইয়েছি। তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিচার পাইনি।

এ সময় ট্রাম্প প্রশ্ন করেন, কারা জমি দখল করেছে, কারা বাড়ি-ঘর দখল করেছে?

উত্তরে প্রিয়া সাহা বলেন, তারা মুসলিম মৌলবাদি গ্রুপ এবং তারা সব সময় রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। সব সময়ই পায়।

এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরপরই বাংলাদেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। এমন নিরেট ও নির্জলা মিথ্যা কথা কেউ প্রকাশ্যে কখনো বলতে পারে, তা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। এমনকি আওয়ামী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, বিশিষ্টজন ও সাধারণ জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ ধরনের বক্তব্যের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকায়িত আছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। এই সংবাদের পরে 'বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ'-এর সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'প্রিয়া সাহার বক্তব্য ব্যক্তিগত। এই বক্তব্যের দায়ভার সংগঠন নিবে না।' অথচ একটি সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আমেরিকার মতো দেশে গিয়ে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি কথা বলে- তা ব্যক্তিগত কথা হয় কিভাবে এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

এদিকে ৭১ টিভির রিপোর্টার প্রিয়া সাহার জন্মস্থান পিরোজপুরের নাজিরপুরে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে চ্যানেলে প্রচার করে। স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য অনুযায়ী নাজিরপুরের হিন্দু-মুসলিম সকলেই সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। তাদের মাঝে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দুদেরকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা বা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো কোনো ঘটনাই সেখানে ঘটেনি।

তারা আরো উল্লেখ করেন, মূলতঃ প্রিয়া সাহা তার ভাইয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সেটাকে সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে, পিরোজপুর ও বাগেরহাটের মাঝখানে একটি দ্বীপ নিয়ে দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ লেগে আছে। কখনো কখনো তা মারামারিতে রূপ নেয়। এতে উভয়পক্ষের হিন্দু-মুসলিম সকলেই অংশ নেয়। ধর্মীয় কারণে নয়; বরং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই লড়াই চলে আসছে। প্রিয়া সাহা এটাকেই সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন বলে এলাকাবাসী উল্লেখ করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামক টিভি চ্যানেলও একই রকম রিপোর্ট প্রচার করে।

প্রিয়া সাহার বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আদালত মামলা নেয়নি। উল্টো সুমন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রিয়া সাহা মানহানিকর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর প্রিয়া সাহা লাইভে আসেন। তার ঐ বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি এ রকম বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দিয়েছি। তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাবস্থায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের কথা উল্লেখ করতেন।

সম্মানিত পাঠক! প্রিয়া সাহার এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফলাফল যা দাঁড়ায়, তা হলো–

০১. তিনি সাধারণ কেউ হলেও তার পেছনে হিন্দু সম্প্রদায় বা ভারতের অনেক বড় সহযোগিতা রয়েছে। নইলে মামুলি কেউ মি. ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন না।

০২. সরকারের প্রথম দিনের শক্ত বক্তব্য থেকে পিছু হটে দ্বিতীয় দিনে গলার সুর নরম করায় আর কারো বুঝতে বাকি নেই যে, সরকার ভারতের চাপের কাছে নতজানু হয়ে পড়েছে।

০৩. প্রিয়া সাহা বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সংখ্যালঘু নির্যাতন মূল উদ্দেশ্য নয়, বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠনগুলোকে আরো উগ্রবাদী করে তোলা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার নগ্ন হস্তক্ষেপ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভারতের প্রিয়ভাজন ও ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নই মুখ্য উদ্দেশ্য।

০৪. দেশের ভাবমর্যাদা রক্ষার বদৌলতে বিশ্বের নিকটে দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন করে দেশকে একটি অকার্যকর ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে প্রিয়া সাহা গং কাজ করে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই এরা বিদেশীদের নিকটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এ দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে।

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ

২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ- গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় শেষের ছয় মাসে ভারতে মুসলিমবিদ্বেষ ৬২ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে বছরের শেষ তিন মাসে

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের বেশির ভাগই ইসরায়লই হামাস সংঘাত ইস্যু নিয়ে। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের এক প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন মাধ্যমে ৬৬৮টি ঘৃণামূলক বক্তব্যের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫৫টি বছরের প্রথমার্ধে ঘটেছে, আর ৪১৩টি শেষ ছয় মাসে ঘটেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিমবিদ্বেষের প্রায় ৭৫ শতাংশ বা ৪৯৮টি মন্তব্যের ঘটনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলোতে ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিমবিদ্বেষ বক্তব্য দেখা গেছে। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদি। তার দল বিজেপির শাসনামলে মুসলিমবিদ্বেষ বেড়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মার্কিন ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে, তারা বিদ্বেষী মন্তব্য নিয়ে জাতিসংঘ যে সংজ্ঞা দিয়েছে, সে অনুযায়ী যাচাইবাছাই করেছে। প্রতিবেদন বলছে, গাজা ইস্যুতে ৭ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে ৪১টি। বছরের শেষ তিন মাসে যেসব মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, এর মধ্যে ২০ শতাংশই এই ইস্যুতে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের দিকে ইঙ্গিত করেছে যা জাতিসংঘ মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেছে। এছাড়া সম্প্রতি ভারতে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের নামে মুসলমানদের ধর্মীয় অবকাঠামো মসজিদ ধ্বংসের সংখ্যাও বেড়েছে। এ ছাড়া বিজেপির শাসনামলেই কর্ণাটকের ক্লাসরুমে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১]

প্রিয় পাঠক! দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বাংলাদেশের মতো ভালো অবস্থানে অন্য কোনো রাষ্ট্র নেই। বিশ্ববাসী মিয়ানমারের নৃশংসতা দেখেছে। কয়েক লাখ মুসলিমকে সন্ত্রাসী বৌদ্ধরা দেশান্তর করেছে। অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মা-বোনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। এদিকে প্রিয়া সাহার প্রিয়ভূমি(!) ভারতে বিজেপি সরকারের মদদে চরম উগ্রবাদী আরএসএস ও অন্য সংগঠনগুলো মুসলিমদের সাথে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণে মেতে উঠেছে। সারা পৃথিবী তাবরিজ আনসারীর লোমহর্ষক মৃত্যু নীরবে অবলোকন করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫০ জন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম বলেও মুসলিমরা রেহাই পাচ্ছে না ভারতে। কই বাংলাদেশে তো এখন পর্যন্ত এ ঘটনা কোথাও ঘটেনি যে, কোনো হিন্দুকে মুসলিমরা জোর করে আল্লাহু আকবার বলাচ্ছেন। তাদেরকে অত্যাচার করছেন।

আমরা যদি বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝতে পারব এ দেশে হিন্দুরা কেমন বহাল তবিয়তে আছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টি.আই.বি)-এর একটি গবেষণায় ফুটে উঠেছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সময়ে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুর উপস্থিতি ১০%-এর বেশি ছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে নিয়ে বাংলাদেশে বেশি সমালোচনা হয়, অথচ তার আমলেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি চাকরি পায়। টি.আই.বি'র গবেষক মোহাম্মদ রেজাউল করিম লিখেন,

"The outstanding finding in that the representation of the minority communities in the general cadre of BCS job was noticeably higher in the Ershad regime (13.22%) than that of BNP (5.05%), and awami league (6.34%) regimes. In case of professional cadres, no remarkable difference was observed."

অর্থাৎ- বিসিএস-এর সাধারণ ক্যাডারে সংখ্যালঘুদের চাকরি এরশাদের আমলে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, তার আমলে ১৩.২২%, বিএনপির আমলে ৫.০৫% এবং আওয়ামী লীগের আমলে ৬.৩৪% মাইনরিটি সরকারি চাকরি পায়। প্রফেশনাল ক্যাডারের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনোরূপ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়নি।[২]

উক্ত জরিপ অবশ্য ২০০৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে এ চিত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে ওলামা লীগ কোনো রাখঢাক ছাড়াই পাবলিকলি সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘু নিয়োগের একটি চিত্র পেশ করে। তারা বলে,

৯০ ভাগ মুসলমানদের দেশে চাকরির নিয়োগ আনুপাতিক হারে হতে হবে। কিন্তু প্রশাসনে হিন্দুতোষণ

---

[১] *দেশ রূপান্তর- ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।*

[২] *ডেইলি স্টার- ৩ জুলাই ২০০৭।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হচ্ছে। গত ২০১৩ সালের অক্টোবরে পুলিশের এসআই পদে নিয়োগে ১৫২০ জনের মধ্যে হিন্দু নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩৩৪ জন, যা মোটের ২১.৯৭ শতাংশ। ২০১১ সালে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইতে নিয়োগের ৯৩ জনের মধ্যে ২৩ জন হিন্দু নিয়োগ করা হয়েছে, যা মোটের ২৪.৭৩ শতাংশ। সম্প্রতি ষষ্ঠ ব্যাচে সহকারী জজ পদে নিয়োগ দেয়া ১২৪ জনের মধ্যে ২২ জনই হিন্দু, যা মোটের ১৭ শতাংশ।[১]

(উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মুসলিমরা ৯০ শতাংশ, হিন্দু ৮ শতাংশ ও খ্রিষ্টান-বৌদ্ধরা ২ শতাংশ।)

২০০৭ সালে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ছিল ১৯%, যা ২০১৫ সালে ২৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ হিসাব আরো অনেক বেশি।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দীকি চ্যানেল আই টিভির এক অনুষ্ঠানে বলেন, সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যেসব কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়েছে তাদের ৬৭ জনের মধ্যে ৪৬ জনই অমুসলিম। ৯১ ভাগ মুসলমানের দেশে এভাবে অমুসলিম কর্মকর্তার সংখ্যাধিক্য কোনোভাবেই স্বাভাবিক বিষয় নয়। আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে চায়। আমরা কি অন্যের দ্বারা শাসিত হতে দেশ স্বাধীন করেছি?[২]

তবে আলহামদু লিল্লাহ, গত ৫ই আগস্ট আওয়ামী রেজিমের পতনের মাধ্যমে ভারতের আধিপত্যবাদ অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। এখন সময় এসেছে দেশকে ভারতীয় খপ্পর থেকে সর্বদিক থেকে মুক্ত করা। এখন পর্যন্ত ভারতের দাসত্ব করে যাচ্ছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কিছু মিডিয়া। তাদের ব্যাপারেও সরকারের নতজানু সিদ্ধান্ত রক্তাক্ত জুলাই বিপ্লবকে ব্যাহত করবে। সরকারের উচিৎ এসব ভারতীয় সেবাদাস মিডিয়াসহ ইসকনকে নিষিদ্ধ করে ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

তথ্যসূত্র : *০১. দৈনিক নয়া দিগন্ত। ০২. দৈনিক প্রথম আলো। ০৩. দৈনিক ইনকিলাব। ০৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন। ০৫. যুগান্তর। ০৬. দেশ রূপান্তর। ০৭. The Daily Star। ০৮. মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই, মাহমুদুর রহমান। ০৯. উইকিপিডিয়া। ১০. বিভিন্ন প্রবন্ধ।*

---

[১] *আমাদের সময়.কম- ১৭ অক্টোবর ২০১৫।*

[২] *মূলধারা বাংলাদেশ- ১৫ জানুয়ারি ২০১৬।*

মশা মারতে কামান দাগা

[৩৩ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

এ মশার দ্বারা রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। বাকি ১ শতাংশ আছে এডিস মশা। এই মশার কামড়েই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ডেঙ্গু জ্বরে রক্তের প্লাটিনেট কমে যায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিই জানেন এর ভয়াবহতা। এখন আমাদের দেশে গ্রাম এবং শহরসহ সবখানে ডেঙ্গুর হানা প্রকট আকার ধারণ করেছে। রাজধানী রয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকিতে। এই কঠিন পরিস্থিতি সবাইকে চমকে দিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু মোকাবেলায় সাড়ে ২২ লাখ ডলার সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে এবং এই হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২০২৫ সালে মারা গেছে ২৫৫ জন। ডেঙ্গুর কালো থাবা আগেও ছিল। এডিস মশা যে দেশে ঢুকেছে, সেই দেশ থেকে আর সহজে বের হচ্ছে না। নানাভাবে বংশবৃদ্ধি করেই যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই সে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে। দিনে রাতে যে কোনো সময়ই এই মশা কামড়ায়। জনমনে আতঙ্ক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সামান্য জ্বর হলেই ডেঙ্গুর ভীতি কাজ করছে।

ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অধিক সচেতন এবং খাদ্য তালিকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে। সারা শরীর ঢেকে রাখা, ঘরের দরজা জানালায় নেট ব্যবহার করা জরুরি। ঘরের ফুলদানি অব্যবহৃত কৌটায় জমে থাকা স্বচ্ছ পানি ফেলে দিতে হবে যেন এডিস মশার লার্ভা না থাকে। বাড়ির ছাদে বা পাশে বাগান, আশেপাশের ঝোপঝাড়, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, ডাবের খোসা, ফুলের টব এবং জমে থাকা বৃষ্টির পানি ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পেরে যেন বংশবিস্তার করতে না পারে। ডেঙ্গু জ্বর নিশ্চিত হলেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং তরল খাবার বেশি বেশি খেতে হবে। এই রোগ ছোঁয়াচে নয় বা বাতাসে ছড়ায় না। একবার ডেংগু হলে আবারও হতে পারে, কেননা এতে চারটি ভিন্ন সেরোটাইপ আছে। কিছু বিভ্রান্তি এবং বেশি বেশি ভীতি পেলেও আমাদের চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেই হবে। এডিস মশার বংশবিস্তারের পরিবেশ আমাদের চারপাশেই বিদ্যমান। যে কারো অসতর্কতা বা গাফিলতির কারণে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মশা সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড় এডিস মশা সে গোল দেওয়ার চেষ্টা করবে আর আপনি তার গোল দেওয়া ঠেকাবেন। খানিকটা হোঁচট খেলেও আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ সবশেষে জিতবেই জিতবে। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রতিবেশীর প্রতি অহেতুক ধারণা পোষণ করা

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

প্রতিবেশীর প্রতি অহেতুক ধারণা পোষণ করা ইসলামে হারাম এবং এটি একটি গুরুতর পাপ। এর পরিবর্তে প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ, তাদের প্রতি সদয় হওয়া এবং প্রয়োজনে সাহায্য করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই দুই এক ইঞ্চি জমিজমা, পানি নিষ্কাশন কিংবা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা না রেখে আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো মীমাংসা করে নিতে হবে। কারণ আমরা যেসব জিনিস নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শত্রুতা করি, যুল্ম অত্যাচার করি, সেই জিনিসগুলো কিন্তু দুনিয়াতেই থেকে যাবে। কিন্তু আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে। হাদীসে এসেছে,

আবূ তুফায়েল ‘আম্র ইবনু ওয়াসিলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের সালাম দিলো। তারাও সালামের উত্তর দিলো। লোকটা অতিক্রম করে চলে গেলে তাদের মধ্যকার একজন বলল, আল্লাহর কসম! আমি মহান আল্লাহর জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। বৈঠকের লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! তুমি যা বললে, তা কতই না মন্দ! আমরা অবশ্যই এ বিষয়টি তাকে অবহিত করব। তাদের মধ্যকার একজনকে লক্ষ্য করে তারা বলল, হে অমুক! তুমি যাও, গিয়ে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করো। তাদের প্রেরিত দূত তাকে পেয়ে বিষয়টা অবহিত করল, যা ঐ লোকটা বলেছিল। লোকটা তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি মুসলমানদের একটি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের মাঝে অমুক লোকও ছিল। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। তারাও সালামের উত্তর দিলো। আমি যখন তাদের নিকট থেকে চলে আসলাম, তখন তাদের মধ্যকার এক লোক এসে আমাকে সংবাদ দিলো যে, অমুক ব্যক্তি বলছে, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। সুতরাং আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কেন আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এ লোকের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী তার (সকল বিষয়) সম্পর্কে আমি অবহিত। আল্লাহর কসম! আমি তাকে ফর্য সালাত –যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে তা ব্যতীত অন্য কোনো (নফল-সুন্নাত) সালাত আদায় করতে দেখিনি। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে-কি আমাকে কখনো নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ব্যতীত বিলম্বে সালাত আদায় করতে দেখেছে? আমাকে কি মন্দভাবে ওযূ করতে এবং অপূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ‘-সিজদা করতে দেখেছে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না (এরূপ দেখিনি)। অতঃপর সে বলল, যে মাসে পুণ্যবান ও পাপী সকলেই সিয়াম পালন করে থাকে সে মাসে ব্যতীত তাকে কখনো (নফল-সুন্নাত) সিয়াম পালন করতে দেখিনি। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে কি আমাকে কখনো সিয়াম ভঙ্গ করতে কিংবা তার কোনো হক্ব নষ্ট করতে দেখেছে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। অতঃপর সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তাকে কখনো কোনো ভিক্ষুককে দান করতে দেখিনি। আর তাকে আল্লাহর রাস্তায় কোনো কল্যাণকর কাজেও কখনো তার সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় করতে দেখিনি। কেবল এই সাদাক্বাহ্ (যাকাত) ব্যতীত যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমি কি কখনো যাকাত থেকে কিছু গোপন করেছি অথবা যাকাত আদায়কারীকে কিছু কম দিয়েছি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকটিকে বললেন, ‘তুমি যাও নিশ্চয়ই আমি জানি যে, সে তোমার চেয়ে উত্তম’।[৪৫]

অতএব, প্রতিবেশীর ব্যাপারে কোনো অহেতুক ধারণা পোষণ না করা, তাদের সঙ্গে কখনোই রূঢ় আচরণ করা যাবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক হতে হবে ভ্রাতৃত্বের, ভালোবাসার। অথচ আজকাল শহুরে মানুষরা তো প্রতিবেশীকে চেনেও না। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে বছরের পর বছর। অথচ সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের অমুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গেও নম্র ব্যবহার করতেন। তাঁদের ঘরে মাঝে মাঝে উপহার পাঠাতেন।

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য তাঁর পরিবারে একটি ছাগল জবেহ করা হলো। তিনি এসে বলেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে (গোশ্ত) উপহার পাঠিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর অধিকার প্রসঙ্গে জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হলো যে, হয়তো শিগগিরই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবে।[৪৬] ☒

---

[৪৫] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৩৮০৩।*

[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪৩।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ : যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা

–প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী*

ভূমিকা : "ধার্মিকরাই সুখী" একটি চিরাচরিত জীবনমুখী সকল দেশে প্রচলিত বাস্তব প্রবাদ। দেশের বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা নীতিতে যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো– 'আল্লাহ তা'আলা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া।' অথচ আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে শিক্ষাকে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত এ স্তরেই স্থাপিত হয়। সাধারণত দেশ জাতি এবং ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিচালিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাসে দেখা যায় যে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এই স্তরে এই বিষয়টি পড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষকের পদ নেই। পদ না থাকার কারণে স্বভাবতই কোনো স্কুলে এ বিষয়ে শিক্ষক নেই। আশ্চর্যের কথা হলো ছাগল দিয়ে লাঙ্গল চাষ করানোর মতো সাধারণ শিক্ষকদের দিয়ে এ বিষয়টি পড়ানো হয়। তা-ও আবার ভিন্ন ধর্মের সাধারণ শিক্ষকদের দিয়ে।

একজন সাধারণ শিক্ষক যখন পড়াশোনা করেছেন তখন তারও ইসলামী শিক্ষার কোনো শিক্ষক ছিল না যার কারণে তিনি এ বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত। তাকে দিয়ে ইসলাম শিক্ষার ক্লাস করানো মানে মাঝি বিহীন নৌকা চালানো। সি.এস. লিউস বলেছেন, শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে কিন্তু নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা মানুষকে সুচতুর শয়তানে পরিণত করে।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় সাধারণত সে ক্লাসটি সেভাবে হয় না। কারণ শিক্ষার্থীরা সেখানে কোনো আনন্দ বা মজা পায় না। এজন্য ক্লাসের প্রতি তারা কখনো মনোযোগী হয় না। যখন অন্য ধর্মের একজন লোক ক্লাস নেন তখন তো ক্লাসের অবস্থা কি সেটা সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষককে যখন বিষয়টি পড়াতে দেওয়া হয় তিনি নিজেও আগ্রহী থাকেন না এই বিষয়ে। সরকার এদিকটি নিয়ে কখনো ভাবেনি বা চিন্তাও করেনি বা চিন্তার সুযোগ ছিল না মনে হয়। এতে পাঠ্যসূচিতে ধর্ম শিক্ষা বিষয়টি থাকলেও ধর্মীয় শিক্ষক না থাকার কারণে বিষয়টির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

আল-কুরআনের ৯৬ নং সূরা আল-আ'লা-কে শিক্ষার মৌলিক ৫টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা-

১. সকলকে পড়তে হবে। **২.** সকলকে পড়তে হবে তার রবের নামে। **৩.** উত্তম শিক্ষার জন্য একজন উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন অবধারিত। **৪.** শিক্ষা দিতে হবে হাতে কলমে উপকরণের মাধ্যমে। **৫.** শিক্ষা দিতে হবে অজানা বিষয়কে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এই জন্য আমি উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি।

তাই দেশ জাতি রাষ্ট্রকে বাঁচাতে দেশের নাগরিককে সুনাগরিক, সুশিক্ষিত, দেশপ্রেমিক এবং ধর্মপ্রাণ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা : ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫,৫৬৬টি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৪১৪৯। সর্বমোট ৬৯,৭১৫টি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ৩,৮৪,৫১৩ জন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই সংখ্যাটি ২০২৩ সালের এবং এখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ নারী শিক্ষক রয়েছেন। শূন্য পদ সংখ্যা ৭৮৩৮০।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য : দেশের বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষা নীতিতে যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো (যদিও এসব উদ্দেশ্যের বেশ কিছু পয়েন্টের সাথে ইসলামের 'আক্বিদাহ্গত পার্থক্য রয়েছে)।

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা। যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায়।

২. আল্লাহ তা'আলা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

*আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

৪. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যম সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৬. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।

৭. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্য : দেশে বসবাসরত ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত ধর্ম শিক্ষা গ্রন্থে যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তাতে মৌলিক চারটি বিষয় রয়েছে– **১.** স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। **২.** শিক্ষা আচার সর্বস্ব না হয়ে ধর্মের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি। **৩.** শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলী অর্জন। **৪.** সৎ সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ।

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : সকল ধর্মেই নৈতিকতার গুরুত্ব রয়েছে। কোনো ধর্মই নৈতিকতা বিহীন শিক্ষাকে সমর্থন করে না। কারণ নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ ধর্ম শিক্ষা যথাযথভাবে না থাকার কারণে সমাজে আমরা দেখছি দুর্নীতি, হত্যা, বিশৃঙ্খলা, ধর্ষণসহ নানারকম সামাজিক অনাচার।

ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য : ইসলামে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য বিষয়ে কুরআন হাদীসে অনেক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এই ছোট্ট পরিসরে সে বিষয়ে আলোকপাত করা মোটেই সম্ভব নয়। আমি শুধু নিম্নে দু'টি আয়াত এবং রাসূল ﷺ থেকে তিনটি হাদীসের অংশ উল্লেখ করছি–

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ﴾

"যেমন আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের থেকেই একজন রাসূল যিনি তোমাদের পাঠ করে শুনাবেন আমার নিদর্শনসমূহ তোমাদের করবেন পরিশুদ্ধ, তোমাদের শিক্ষা দিবেন গ্রন্থ, হিকমাহ এবং তোমাদের অজানা বিষয়।"[৪৭]

[৪৭] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৫১।*

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে ধর্ম প্রচারকদের পাঁচটি গুণ থাকতে হবে– **১.** ইসলামের সকল মহাপুরুষ শিক্ষক জাতির শিক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকবেন। **২.** তারা সবাই স্বজাতি থেকেই নির্বাচিত হবেন। **৩.** তারা সবাই ধর্মীয় গ্রন্থ শিক্ষা দিবেন। **৪.** জীবন পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। **৫.** তারা অজানা বিষয় শিক্ষা দিবেন।

উত্তম শিক্ষার জন্য একজন উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা : উত্তম শিক্ষার জন্য একজন উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي. আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন, উত্তমরূপেই শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مكارم الْأَخْلَاقِ আমি তোমাদের উত্তম চরিত্রে পূর্ণতা দানে আগমন করেছি।[৪৮]

তার মানে একজন শিক্ষক হওয়ার জন্য তাকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, একজন শিক্ষককে উন্নত চরিত্র এবং নৈতিকতার অধিকারী হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষাবিষয়ক পরিভাষার গুরুত্ব : ইসলামে শিক্ষা বিষয়ে তারবিয়া (تربيه), তা'লিম (تعليم), তাদিব (تأديب), তাদরিব (تدريب), তাদরিস (تدريس) –এ পাঁচটি মৌলিক পরিভাষা পাওয়া যায়। ইসলামে প্রচলিত এ পরিভাষাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ এবং মৌলিক বিষয়গুলো এতে প্রতিভাত হয়েছে। অর্থাৎ- ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সামর্থ্যবান হয়।

বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০-এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে– ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসকিতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মালম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এ সকল ব্যবস্থা সুসংহত ও গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় মূল বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে।[৪৯]

প্রাথমিক বিদ্যালয় ধর্মীয় শিক্ষক না থাকার বাস্তবতা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার বাস্তবতা খুবই করুন। মাঝি ছাড়া যেমন নৌকা চলে না কিন্তু যুগ যুগ ধরে

[৪৮] *সহীহুল বুখারী; বায়হাক্বী; মুসনাদ আহমাদ।*
[৪৯] *জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০।*

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক ছাড়াই ধর্ম শিক্ষা পাঠদান চলে আসছে। এর কুফল কি হয়েছে তার বাস্তবতা নিম্নে একটু আলোচনা করা হলো– দূর্নীতিমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই। ধর্ম শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী ও নীতিবান করে গড়ে তোলে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা চালু আছে। আছে মাধ্যমিকেও। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পাঁচজন শিক্ষক থাকেন। পাঁচজন শিক্ষকেরই কেউ না কেউ পড়ান ইসলাম শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম শিক্ষা। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক তা পড়ান; কিন্তু ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকরা তা পড়ান।

জীবন-জীবিকায় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিশু পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা পড়ানো হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত ধর্ম শিক্ষকের অভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অনেক স্কুলে ভিন্ন ধর্মের শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন ইসলাম ধর্ম শিক্ষা। কারণ ওই সব স্কুলে কোনো মুসলিম শিক্ষক নেই।

অন্যদিকে একই কারণ ও পরিস্থিতিতে মুসলিম শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন হিন্দু ধর্ম শিক্ষা। কিছু স্কুলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের অভাবে ধর্ম শিক্ষার ক্লাসও নিয়মিত হয় না। দায়সারা গোছের পাঠদানের ফলে কোমলমতি শিশুরা ধর্মের মর্ম উপলব্ধি ও নৈতিকতার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজিদ শিক্ষা জড়িত আছে। কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো ধর্মীয় শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের আরবি পড়া ও লেখা ভালোভাবে শেখানো সম্ভব হয় না।

এমনকি বেশিরভাগ শিক্ষক, যারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বই পড়ান, তারা নিজেরাই আরবি পড়তে বা লিখতে পারেন না। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবি পড়া ও লেখা ভালোভাবে শেখানো সম্ভব হয় না। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআন মাজিদ ভালোভাবে পড়তে পারে না।

আমাদের দেশের সব মুসলমান মা-বাবারই ইচ্ছা থাকে তার সন্তান পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিখবে ও পড়বে। কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ভালো শিক্ষক না থাকায় তারা তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে মক্তব-মাদ্রাসায় পাঠান। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি আশঙ্কাজনকভাবে কমছে। ২০২১ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৫,৮৮২টি। গত তিন বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমেছে ৩১৬টি। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত এক বছরের ব্যবধানে ১৩.১৫% বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান হার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বড় ধাক্কা। ৫০ জনের কম শিক্ষার্থী রয়েছে এমন ৩০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে।

ধর্ম শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ : চলতি বছরের ২৯ জুলাইয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় 'প্রাথমিক নিয়োগ পাবেন সঙ্গীত ও শারীরিক শিক্ষক শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫৮৩টি ক্লাস্টারে একজন করে সঙ্গীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। তারা ওই ক্লাস্টারের প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই দু'টি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সারা দেশের ৯০% মুসলিম ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে দেশে ১% লোকের কোনো কাজে আসবে না সেই সংগীত বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে অথচ দৈনন্দিন জীবনে সব সময় কাজে লাগবে যে ধর্ম সে ধর্ম বিষয়ের কোনো শিক্ষক নেই।

সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত : সরকারের উদ্দেশ্য হলো দেশের ১০০% লোককে স্বাক্ষরিত করা। শুধু ধর্ম শিক্ষার প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণে অনেক ইসলামী পরিবার তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে আর পাঠাচ্ছে না।

বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস : ধর্মীয় মূল্যবোধ এর উপরে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের শিশুদেরকে আর প্রাথমিক বিদ্যালয় ধর্মহীন শিক্ষার জন্য পাঠাচ্ছে না এতে আসতে আসতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার প্রসার : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা যথাযথ না হওয়ায় সন্তানগণ নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছে।

সুনাগরিক গড়ে ওঠার পথে বাঁধা : নীতি নৈতিকতা ছাড়া কোনোদিন শিক্ষার্থীরা সুযোগ্য দক্ষ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে না।

ধর্মহীন শিক্ষা একটি অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা : ধর্মহীন শিক্ষা আসলে একটি অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই দেশের ৯০% মুসলিম হওয়ায় তারা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

সমাজে কুপ্রভাব বিস্তার : ধর্ম মানুষকে সুসভ্য করে। কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষা শিক্ষিতরা ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকার কারণে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সমাজে কুপ্রভাব পড়ে।

আধুনিকতার নামে ধর্মহীন শিক্ষার প্রসার : 'আধুনিকতার নামে ধর্মীয় শিক্ষা না দেয়ায় তরুণ-তরুণীরা যখন বড় হতে থাকে, তখনই তারা ধর্মীয় জ্ঞানের শূন্যতা অনুভব করে। ধর্মীয় বিষয়গুলো জানতে দ্বারস্থ হয় ইন্টানেটের। অন্যদিকে ইন্টারনেটের বিশাল এ উন্মুক্ত মাধ্যমে ফাঁদ পেতে রাখে বিপথগামী জঙ্গিরা। বিপুল সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্ম ইসলামের 'জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে জঙ্গিদের ফাঁদে পা দেয়। শিক্ষার্থীদের ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের এ শূন্যতাকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিরা কৌশলে তাদের মগজধোলাই করে তাদের বিপথে ঠেলে দেয়। এর বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে তারা হারিয়ে যায় জঙ্গিবাদের অতল গহ্বরে। যদি শিক্ষার্থীদের ধর্মের মৌলিক জ্ঞান থাকত তাহলে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় জ্ঞানের রাডারে এটা ধরা পড়ত যে, জঙ্গিরা ধর্মের নামে তাদের ভুল বোঝাচ্ছে। তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারত জঙ্গিদের বিষাক্ত ছোবল থেকে। আগামী প্রজন্মকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখতেও ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সৌন্দর্য তুলে ধরে শিশুদের মনে জঙ্গিবাদের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দিয়ে প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে।

তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ধরে রাখার স্বার্থে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের একই সঙ্গে জীবন-জীবিকার শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিন দিন শিক্ষার্থী সংখ্যা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছ অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসবে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ফলাফল : ১. মানুষকে তার স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে পরিচিত করে। **২.** মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে বা থাকতে সহায়তা করে। **৩.** মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অকুতোভয় করে তোলে। **৪.** মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি প্রাকৃতিক শক্তির গূঢ় রহস্য উদ্ভাবন ও কলাকৌশল আবিষ্কার করে মানবতার কল্যাণ সাধন করে। **৫.** হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ বা স্রষ্টাও সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। **৬.** মানুষের দেহ ও মনের চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করে। **৭.** মানুষের মাঝে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। **৮.** জাগতিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়তে সহায়তা করে। **৯.** নৈতিক শিক্ষা সমাজে আলোকিত মানুষ তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। **১০.** মানুষের ইহকালীন শান্তি (অর্থাৎ- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল ধরনের সমস্যার সমাধান দেয়) ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করে। **১১.** সৎ, চরিত্রবান ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে। **১২.** দুর্নীতিমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। **১৩.** মাদ্‌রাসা তথা ধর্মী শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। **১৪.** সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। **১৫.** সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। **১৭.** সমাজে ও দেশে সৎ লোকের শাসন কায়েম হবে। **১৮.** প্রত্যকেই সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। **১৯.** চরিত্রবান নাগরিকরা সরকার গঠন করবে। **২০.** দেশে সুদ-ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ হবে। **২১.** অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথ রোধ হবে। **২২.** দেশের টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার সুযোগ থাকবে না। **২৩.** সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। **২৪.** যুবকদের অলসতা বিদূরীত হবে ফলে তারা কর্মের প্রতি উৎসাহিত হবে। **২৫.** ধর্ম শিক্ষা মানুষকে নৈতিক বলে বলিয়ান তথা অশুর শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠে। একজন সবল মু'মিন একজন দুর্বল মু'মিন হতে উত্তম। **২৬.** ৯টি বোর্ডের একটি বোর্ড থেকে পাশকারীরা চাকরি থেকে বঞ্চিত এবং বৈষম্যর শিকার হবে না। **২৭.** মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। **২৮.** সমাজে অনেক বৈষম্য বিদূরীত হবে।

সুপারিশমালা : আজকের সেমিনারে আমরা সরকারের কাছে যে বিষয়গুলো সুপারিশ করতে চাই তা হলো– **১.** প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করে শিশু অধিকার নিশ্চিত করণ। **২.** অতি শীঘ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা। **৩.** অতি শীঘ্র ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দান করণ। **৪.** ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষক পদে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি, ইসলামিক স্টাডি এবং কওমি মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিধারীদের ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দান। **৫.** প্রতিটি বিদ্যালয় একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা। **৬.** প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূরানী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা। **৭.** প্রাক প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের দু'বছর মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। **৮.** ভালো শিক্ষিত ইমাম মুয়াজ্জিনকে দায়িত্ব প্রদান করা/ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা। **৯.** প্রতিটি জেলা উপজেলায় একজন করে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া। **১০.** প্রাথমিক শিক্ষার মনিটরিং করতে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মনিটরিং সেল স্থাপন করা।

বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। ৯০% ভাগ মুসলিমের করের টাকায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে না এটা হতে পারে না। তাই অতিসত্বর প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আত্মগঠন

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র

-মো. মনিরুজ্জামান*

[দ্বিতীয় পর্ব]

১৪. উত্তম প্রতিহিংসা- সদাচরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো।"[৫০]

তাফসীর : → অন্যায় বা অবহেলা দেখে ক্ষেপে যাওয়ার বদলে উত্তম আচরণ। → প্রতিশোধ না করে সদাচরণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। → রাগ দমনে 'ভালো প্রতিক্রিয়া'ই সর্বোত্তম।

হাদীসসমূহ-

১. "কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করলে, তার জন্য দু'আ করো; ক্ষমা করো এবং সহনশীল হও।"[৫১]

২. **ক্ষমা মর্যাদা বাড়ায় :** "তিনিই মহান, যিনি কারো প্রতি অন্যায় করলে ক্ষমা করে দেন। যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[৫২]

৩. "তুমি যিনি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো; যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দাও; আর যে তোমার প্রতি যুল্ম করে, তাকে ক্ষমা করো।"[৫৩]

ব্যাখ্যা : প্রকৃত উত্তম প্রতিহিংসা হলো সম্পর্ক নষ্ট না করে; বরং পুনরায় সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

৪. "যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।"[৫৪]

ব্যাখ্যা : অন্যের অন্যায় বা কষ্টকে ক্ষমা করে সদাচরণ করা মহান আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেয়।

১৫. সৌজন্য ও মৃদু ভাষা- দ্বন্দ্বহীন সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দাদের বলে দাও- তারা যেন উত্তম কথা বলে; নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ লাগায়।"[৫৫]

তাফসীর : → রাগের মুহূর্তে কটু কথা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। → নরম ও সুন্দর ভাষা ব্যবহার করলে বিরোধ এড়ানো যায়। → সামাজিক শান্তি ও মমত্ববোধ বজায় রাখে।

হাদীসসমূহ- ১. "সর্বোত্তম মুসলিম হলো যে তার ভাষা ও হাত দ্বারা অন্যদের ক্ষতি না করে।"[৫৬]

২. "যে ব্যক্তি মৃদুভাবে কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তমভাবে সম্মানিত করেন।"[৫৭]

১৬. রাগ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "শয়তান থেকে কোনো কু-প্রেরণা এলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।"[৫৮]

তাফসীর : → রাগের মুহূর্তে শয়তান প্রবল প্ররোচনা দেয়। → "আউযু বিল্লাহ" বলার মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। → মুত্তাকীরা শয়তানের প্ররোচনায় ধরা না পড়ে শান্ত ও সংযত থাকেন।

হাদীসসমূহ- ১. "যে ব্যক্তি রাগের সময় 'আউযু বিল্লাহ' বলে, আল্লাহ তা'আলা তার রাগ নেভান।"[৫৯]

২. "রাগ জাহান্নামের আগুন থেকে; তাই রাগ উঠলে ওযূ করো।"[৬০]

১৭. ন্যায়ের উপর অটল থাকা- বিদ্বেষের প্রভাব থেকে রক্ষা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনরা! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের উপর অটল থাকো... কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন অবিচারের দিকে না ঠেলে।"[৬১]

তাফসীর : → রাগ ও বিদ্বেষ ন্যায়ের পথে বাধা হতে পারে। → সৎ ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ বজায় রাখা মু'মিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। → বিদ্বেষের পরিবর্তে ন্যায় ও সহানুভূতি প্রতিপালন করুন।

হাদীসসমূহ- ১. "যে ব্যক্তি তার বিদ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে সম্মানিত করবেন।"[৬২]

২. "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা।"[৬৩]

১৮. রাগের প্রতিক্রিয়ায় উত্তম আচরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মন্দ প্রতিহত করো উত্তম দ্বারা -তখন যার সাথে শত্রুতা ছিল সে যেন আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।"[৬৪]

** সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, যশোর জেলা শাখা।*

[৫০] *সূরা আল-মু'মিনূন : ৯৬।*

[৫১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২১, সহীহ।*

[৫২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮।*

[৫৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৫০২৪; আলবানী সহীহ।*

[৫৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩১৯।*

[৫৫] *সূরা আল-ইস্রা : ৫৩।*

[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭।*

[৫৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬১২, সহীহ।*

[৫৮] *সূরা আল-আ'রাফ : ২০০-২০১।*

[৫৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩৪, সহীহ।*

[৬০] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৩৩৮, আলবানী সহীহ।*

[৬১] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৮।*

[৬২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২২, সহীহ।*

[৬৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৫০১২, সহীহ।*

[৬৪] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৩৪।*

তাফসীর : → শত্রুতার জবাবে ভালো আচরণ করা শত্রুকে বন্ধুতে রূপান্তর করতে পারে। → উত্তম প্রতিকার সামাজিক শান্তি ও মমত্ববোধ বজায় রাখে। → রাগের প্ররোচনায় উত্তম প্রতিপালন ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

হাদীসসমূহ–

১. "যে অন্যকে ভালোভাবে প্রতিহত করে, আল্লাহ তাকে স্বীকৃতি দেবেন।"[৬৫]

২. "মু'মিনের শ্রেষ্ঠ শক্তি হলো নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা।"[৬৬]

১৯. ক্ষমাশীলতা ও মীমাংসা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাদের ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য আছে, তারা যেন আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করা থেকে বিরত না থাকে। তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন?"[৬৭]

তাফসীর : → আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার আত্মীয় মিসতাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ভাতা বন্ধ করেছিলেন, কারণ তিনি অপবাদ প্রচারে যুক্ত ছিলেন। এ আয়াত নাজিল হলে তিনি তাকে ক্ষমা করে পুনরায় সাহায্য শুরু করেন। → আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন : ক্ষমাশীল হলে আমরাও আল্লাহর ক্ষমা আশা করতে পারি। → ক্ষমা করা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম। → অন্যের ভুলে প্রতিহিংসা নয়; বরং মীমাংসা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি তোমরা কোনো সৎকাজ প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, অথবা কোনো মন্দকে ক্ষমা করো– তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান।"[৬৮]

তাফসীর : → আল্লাহ ক্ষমাশীলকে ভালোবাসেন। → মানুষের দোষ গোপন রাখা ও মীমাংসা আল্লাহর নিকট প্রিয়। প্রতিশোধ না নিয়ে দোষ ক্ষমা করা 'ইবাদতের অংশ। → ক্ষমাশীলতা মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধতা প্রকাশ করে।

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; তাই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো ও মাফ করে দাও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৯]

তাফসীর : → পরিবারের সদস্যদের ভুলে ঝগড়া না করে ক্ষমা করা হলো প্রকৃত মীমাংসা। → পারিবারিক জীবনে ক্ষমাশীলতা থাকলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ক্ষমাশীলতা শুধু সমাজে নয়, পরিবারেও আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা নিজে ক্ষমাশীল, তাই বান্দাকেও ক্ষমা করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা (ইহুদিরা) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদের অভিশাপ দিয়েছি... তবে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৭০]

তাফসীর : → রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শত্রুতার মুখেও ক্ষমাশীল থাকার জন্য। → ক্ষমাশীলতা রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ। → শত্রুতার মাঝেও ক্ষমা করা মীমাংসার সর্বোচ্চ রূপ। → ক্ষমা ও দয়া হলো দা'ওয়াহ'র শক্তিশালী মাধ্যম।

হাদীসসমূহ–

১. "ক্ষমাশীল হও, আল্লাহ তা'আলা তোমার দোষ ক্ষমা করবেন।"[৭১]

২. "যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[৭২]

২০. সৌজন্য ও মৃদু ভাষা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা যেন ক্ষমা করে, উপেক্ষা করে– তোমরা কি ভালোবাস না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?"[৭৩]

তাফসীর : → অন্যদের প্রতি সৌজন্য ও ক্ষমাশীল হওয়া মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য। → রাগ ও কটু কথার পরিবর্তে সৌজন্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্ব কমায়। → মহান আল্লাহর ক্ষমা কামনার জন্য অন্যকে ক্ষমা করা আবশ্যক।

হাদীসসমূহ–

১. "যে মানুষের ক্ষতি হলেও ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ ক্ষমা করবেন।"[৭৪]

২. "রাগের মুহূর্তে শান্ত থাকা বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।"[৭৫]

২১. মু'মিনদের বিশেষ গুণ– শান্ত প্রতিক্রিয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রহমানের বান্দারা... যখন অজ্ঞরা সম্বোধন করে, তারা বলে 'সালাম'।"[৭৬]

তাফসীর : → উসকানিমূলক কথাতেও শান্ত ও সৌজন্যমূলক প্রতিক্রিয়া। → রাগ নিয়ন্ত্রণ ও সদাচরণ

---

[৬৫] *জামে' আত্‌ তিরমিযী- হা. ১৩৩১, সহীহ।*
[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৯।*
[৬৭] *সূরা আন্‌-নূর : ২২।*
[৬৮] *সূরা আন্‌-নিসা : ১৪৯।*
[৬৯] *সূরা আত্‌-তাগা-বুন : ১৪।*
[৭০] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ১৩।*
[৭১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৬০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৯৯।*
[৭২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৭৩।*
[৭৩] *সূরা আন্‌-নূর : ২২।*
[৭৪] *জামে' আত্‌ তিরমিযী- হা. ১৩২৮, সহীহ।*
[৭৫] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৯০৮, সহীহ।*
[৭৬] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন : ৬৩।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মু'মিনদের জন্য উত্তম। → সামাজিক শান্তি ও নৈতিকতার প্রতীক।

হাদীসসমূহ–

১. "যে তার গালে আঘাত সহ্য করে এবং উত্তরে ক্ষেপে না যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দেবেন।"[৭৭]

২. "যে রাগ সংযম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন।"[৭৮]

২২. ধৈর্য– মহান আল্লাহর সাহায্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি শাস্তি দাও, তবে যতটুকু তোমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে ততটুকুই; কিন্তু ধৈর্য ধরলে তা অবশ্যই উত্তম... ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে।"[৭৯]

তাফসীর : → সমান জবাব দেওয়া ন্যায্য হলেও ধৈর্যই শ্রেষ্ঠ। → আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাহায্য করেন এবং সম্মানিত করেন। → রাগ দমন ও শান্ত প্রতিক্রিয়া সামাজিক কল্যাণ আনে।

হাদীসসমূহ–

১. "যে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুরস্কার রেখেছেন।"[৮০]

২. "রাগ দমন করা মুসলিমের জন্য সাদাক্বাহ্ সমান।"[৮১]

২৩. ন্যায়ের প্রতি অটল থাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনরা! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের উপর অটল থাকো... কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন অবিচারের দিকে না ঠেলে।"[৮২]

তাফসীর : → রাগ ও বিদ্বেষ ন্যায়ের পথে বাধা হতে পারে। → ন্যায়পরায়ণ আচরণ বজায় রাখা মু'মিনদের দায়িত্ব। → সমাজে শান্তি, সংযম ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।

হাদীসসমূহ–

১. "যে ব্যক্তি বিদ্বেষ সংযম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দেবেন।"[৮৩]

২. "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা।"[৮৪]

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০০।*
[৭৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২৯, সহীহ।*
[৭৯] *সূরা আন্-নাহ্ল : ১২৬।*
[৮০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬১০।*
[৮১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৩২, সহীহ।*
[৮২] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৮।*
[৮৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২২, সহীহ।*
[৮৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৫০১২, সহীহ।*

পারিবারিক জীবনে রাগ নিয়ন্ত্রণ

২৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগ দমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তমভাবে বাস করো; আর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হতে পারে তোমরা একটি জিনিস অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে বহু কল্যাণ রেখেছেন।"[৮৫]

আয়াতটি শিখাচ্ছে– দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো রাগ-অভিমান স্বাভাবিক। কিন্তু স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া, অন্যায় করা, কিংবা রাগকে স্থায়ী করা ইসলামী চরিত্র নয়।[৮৬]

হাদীস : "কোনো ঈমানদার পুরুষ যেন কোনো ঈমানদার নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো একটি গুণ অপছন্দ করে, তবে অন্য কোনো গুণ সে অবশ্যই পছন্দ করবে।"[৮৭]

বার্তা : দাম্পত্য জীবনে রাগ দমন করা হলো কল্যাণ ও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মূলনীতি।

২৫. বাবা-মা ও সন্তানের মাঝে রাগ নিয়ন্ত্রণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"আর তোমার রব আদেশ করেছেন– তোমরা তার ছাড়া কারো 'ইবাদত করো না এবং মা-বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো।"[৮৮]

এখানে "ইহসান" মানে শুধু ভদ্রতা নয়; বরং রাগ দমন করে নরম ভাষায় কথা বলা, সেবা করা এবং তাদের দু'আ কামনা করা।[৮৯]

হাদীস : এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, 'আমার উত্তম সঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হক্ব কার?' তিনি বললেন : "তোমার মা।" তিনবার এভাবে বলার পর চতুর্থবার বললেন : "তারপর তোমার বাবা।"[৯০]

বার্তা : বাবা-মার সাথে রাগ প্রকাশ নয়; বরং ধৈর্য, বিনয় ও সুন্দর ব্যবহারই ইসলামী চরিত্র। *[চলবে ইনশা-আল্লাহ]*

[৮৫] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*
[৮৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ১/৪৯৪।*
[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৬৯।*
[৮৮] *সূরা বানী ইস্রা-ঈল/ইস্রা : ২৩।*
[৮৯] *তাফসীরে জাকারিয়া- সূরা বানী ইস্রা-ঈল/ইস্রা।*
[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫১৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৮।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নিভৃত ভাবনা

আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

[পূর্ব প্রকাশের পর]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ ও জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র 'ইবাদত করার জন্য। প্রশ্ন আসতে পারে– 'ইবাদত কী এবং কোনটি? 'ইবাদত শব্দটি আরবি 'ইবাদাহ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো– মহান আল্লাহর উপাসনা, আনুগত্য ও একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। 'ইবাদতের উপায় বহুবিধ। মানুষের সারাটি জীবন 'ইবাদতের আঁধার হতে পারে। মহান আল্লাহর হুকুম ও নবী (ﷺ)-এর তরীকা অনুসরণ করে নিত্যজীবনের প্রতি মুহূর্ত ও ইভেন্ট 'ইবাদত হতে পারে।

নবী (ﷺ)-এর হুকুম অনুসন্ধান করে জীবন পরিচালনা করা 'ইবাদত। নামায, রোযা, তিলাওয়াত, যিক্র-আযকার, যাকাত, কুরবানী ও দান-সাদাক্বাহ ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত হলো– আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা। ইহ ও পরকালীন সফলতা লাভের উপায় আল্লাহ বাতলিয়ে দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে বিঘোষিত হয়েছে–

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত তারাই সফলকাম।"[৯১]

যারা দা'ওয়াতের কাজ করে তাঁদের দাঈ' বলা হয়। আর দাঈ'দের দা'ওয়াত ইসলামের আলোকবর্তিকা। দা'ওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে। আর দা'ওয়াত না থাকলে দ্বীন থাকবে না। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অন্তর্ধান পরবর্তী দা'ওয়াতের কাজ বন্ধ ছিল। ফলে শির্কের সয়লাব বয়ে যায়। বায়তুল্লাহতে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। সমগ্র আরব তথা বিশ্বে আল্লাহদ্রোহীতার বীজ উপ্ত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে লজ্জাকর বিপর্যয় নেমে আসে। এমনি একটি সময়ে একজন নেতার আবির্ভাব অনুভূত হচ্ছিল। বিশ্বখ্যাত সেমেটিক অধ্যাপক পি. কে হিট্টি বলেন, "The stage was set, The moment was psydoligical comiaj for great national leader."

মহানবী (ﷺ)-এর আবির্ভাবের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির ঢেউয়ে কলুষিত সমাজ পরিচ্ছন্ন হয়।

ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : সীলাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ- নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকে সংশোধন করা। আর দা'ওয়াতের কাজ ছাড়া যা কখনো সম্ভব নয়।

নিজের সংশোধন ও অন্যের সংশোধনের জন্য ইল্‌ম অর্জন আবশ্যক। এজন্য ইল্‌ম অর্জন করা জরুরি। অনুরূপভাবে অর্জিত বিতরণও তেমনি জরুরি। ইল্‌ম অর্জন ও দাঈ' হিসেবে ইল্‌ম অনুশীলন ও বিতরণ যারা করবেন তাদের সংসার জীবন কীভাবে নির্বাহ হবে? ইতিপূর্বে অবগত হওয়া যায় যে, পেশাগত ব্যস্ততা উলামায়ে কিরামকে ইল্‌ম চর্চা হতে দূরে সরায়নি। সকল ব্যস্ততার পরেও তারা নিজেদের ইল্‌ম চর্চায় ব্যস্ত রেখেছেন। সময়ের যথাযথ ব্যবহারের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা সময় নষ্ট করতেন না। তারা সস্তা বিনোদনের ফাঁদে কখনো পা দেননি। ইল্‌মই ছিল তাদের বিনোদন। আবূ 'ইমরান মূসা ইবনু মুহাম্মদ ইবনু সা'ঈদ আন্দালুসি একদা তার ছেলে বলেছিলেন, "তুমি কি মুতাআলার বাইরে অন্য কিছুতে আনন্দ পাচ্ছো?" উত্তর ছিল– "আল্লাহর শপথ! আমি তো এর মতো তৃপ্তি আর কিছুতেই পাই না।" ইল্‌মের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষনের ফলে তারা সর্বোচ্চ সময় এর পেছনেই ব্যয় করতেন।

ফাতাহ ইবনু খাকান ছিলেন একজন বিদগ্ধ কবি এবং সাহিত্যিক। 'আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। দায়িত্বের সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর পড়ালেখা করতেন। খলিফা দরবার থেকে বের হলেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে কিতাব পড়তেন। খলিফা দরবার থেকে অল্প সময়ের জন্য উঠলেই তিনি নিবিষ্টচিত্তে পড়া শুরু করতেন। তার ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার। আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াযি বলখি ছিলেন একাধারে মন্ত্রী ও বিচারক। তিনি দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে লেখালেখি করতেন। জ্ঞানচর্চার এমনিতরো অভাবনীয় উপমা আমাদের চমৎকৃত করে।

★ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৯১] সূরা আ-লি-'ইমরান : ১০৪।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

উলামায়ে কিরাম নানা পেশা অবলম্বন করে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতেন। ওই অর্জিত অর্থ দিয়ে তারা কিন্তু বিলাসিতা করতেন না। অলসতা ও বিলাসিতা ছিল তাঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ অভ্যাস। তারা সাধারণতঃ উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগই জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। ইমাম লাইস ইবনু সা'দ তাঁর জমিদারী থেকে বার্ষিক আশি হাজার দিনার পেতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি তার পুরোটাই অভাবগ্রস্থ ছাত্র ও আলেমদের জন্য ব্যয় করতেন। বিদ্যাচারের প্রতি কতটা অনুরাগী হলেই এ সমস্ত ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ দরিদ্র ফকি্হ ও মুহাদ্দিসদের জন্য ব্যয় করতেন। ইমাম আবূ উমাইদ মুহাম্মদ বিন 'ইমরান তার সময়ে তার গৃহে ৫০টি বিছানা তৈরি রাখতেন, যেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সফরে আসা ছাত্র ও আলেমরা সেখানে নির্বিঘ্নে অবস্থান করতে পারে। ইমাম হাফস ইবনু কুফি একজন প্রথিতযশ্যা মুহাদ্দিস ছিলেন। কুফায় বসবাসকারী এই মুহাদ্দিস ছিলেন সাতিশয় দানশীল। তিনি বলতেন যে, "আমার ঘরে খাবার খাবেন না, আমি তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করবো না।" এমনি হাজারো উপমাতে ভরা তদানিন্তন ব্যক্তিবর্গ ইল্‌মচর্চা করছেন। অবাবিত করেছেন ইল্‌মচর্চার সকল দিক।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন যগ্যসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। ন্যায় পরায়ন ও সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। ইসলামী জ্ঞানদ্বীপ্ত ফিকহ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি নিজ ব্যবসায়ের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন শিক্ষক ও হাদীস বিশারদ। হাদীস চর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতার মাধ্যমে যৎসামান্য প্রাপ্ত হাদিয়া ছিল তার গ্রামাচ্ছাদনের উপায়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্‌রিস আশ-শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি জীবিকার্জনের জন্য কাজীর দায়িত্ব পালন করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের পেশা ছিল শিক্ষকতা। যৎসামান্য বেতনে তার নিত্যদিনের ব্যয় কোনোভাবে চলতো। হাদীস সংগ্রহ করেই তিনি তৃপ্তবোধ করতেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীস বিশ্ববাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ। তেমনিভাবে কাল থেকে কালান্তরে পণ্ডিতগণ ইসলামের খিদমত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের আহার বিলাস তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।

কিন্তু আধুনিককালে আমরা কি দেখছি। বক্তৃতা করে কিংবা ইল্‌ম শিক্ষা দিয়ে পয়সা উপার্জন যেন সর্বগ্রাহ্যতা লাভ করেছেন। বক্তারা যখন মাহফিলে যান, অগ্রিম চুক্তি করেন।

২০১১ সালে আমার মরহুম পিতা হাজী মো. সেতাব উদ্দিনের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রায় চল্লিশ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে একটি ক্বওমী মাদ্‌রাসা গড়ি। প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে মানুষকে জানান দেওয়ার জন্য মাহফিল করতে হয়। জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক, যিনি চমৎকার ওয়াজ করেন। তাঁর পিতার খ্যাতির সৌরভে সুরভিত হয়ে দেশব্যাপী ওয়াজের জন্য খুবই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁকে একবার ওয়াজ করবার জন্য আহ্বান করেছিলাম। তিনি বললেন, বিশ হাজার টাকা লাগবে। আমি বললাম, আচ্ছা একটু এদিক-ওদিক করে হবে। তিনি বললেন, নাহ! ভাই ১৮/২০ তো হতেই হবে। তাজ্জব হয়ে গেলাম। তাকে আর আসার জন্য অনুরোধ করিনি। আমি এমনও জানি যে, ৫,০০০/- টাকা সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর আর ৫০,০০০/- টাকা খরচের ঝুঁকি নিতে হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার মানুষকে। শুধুমাত্র উদ্বোধন করবেন। দু'জনের যাতায়াত বিমান ভাড়া, মোটা খাম ও ভূরিভোজ তো আছেই।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আমি কিন্তু Hate sin, not the sinner দর্শনে বিশ্বাসী। কাউকে আঘাত দিতে চাইনি। কেউ গায়ে মাখবেন না। যদি করতে চান, তাহলে ধরে নিব, 'ঠাকুর ঘরে কে?, আমি তো কলা খায়নি' দলের লোক আপনি।

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, দাঈ' হিসেবে আমার ভূমিকা আমি কতটুকু রাখছি। কিয়ামতের মাঠে এইজন্য তো জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহর রহমতে দেশের আনাচে কানাচে ক্বওমি মাদ্‌রাসার জাল বিস্তৃত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের জনমতে অলক্ষেব কম নয়। দক্ষিণের হাটহাজারী, মেথল, পটিয়া থেকে উত্তরে রাজশাহী নওগার বৃহদকারের অসংখ্য মাত্রাসার কথা আমরা জানি। যাত্রাবাড়ির মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, মিরপুর মাদ্‌রাসায় প্রচুর সংখ্যক ছাত্র প্রতিবছর বের হয়, এমনিভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার আলেম দাওরাতুল হাদীস সম্পন্ন করছে। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র সে অনুযায়ী সম্প্রসারিত হচ্ছে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরা বসে নেই। তাঁরা সকল ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। কিন্তু সরকারি কর্মকাণ্ডের মতো মূল স্রোতধারায় আজও উপনীত হতে পারেনি। ইসলামের নানান দিকে অবদান রাখছেন ঠিকই কিন্তু ইপ্সিত উপায়ে স্বোপার্জনের ক্ষেত্রটা তেমন দৃশ্যমান হচ্ছে না। অথচ এঁরা তথ্য প্রযুক্তি, প্রকাশনা অফিস ব্যবস্থাপনা, গ্রাম্য ডাক্তারী, ইউনানী চিকিৎসা ও হালাল উপায়ে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি অবদান রাখতে পারেন। আকাবির, আসলাম, সাহাবী ও নবী-রাসূলদের হালাল জীবিকা অন্বেষনের পথ অনুসরণ করে আজও সমাজ ও দেশের অনুকরণীয় আদর্শের ভূমিকার অবির্ভূত হতে পারেন। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মশা মারতে কামান দাগা

–মো. কায়ছার আলী*

মশা মারতে কামান দাগা। এই বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে সামান্য কাজে বেশি আয়োজন। মশা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, বিড়ালের তুলতুলে লেজের আঘাতেও তাদের প্রাণহানি ঘটে। বাগধারাটি প্রচলনের সময় কামান ছিল সর্বোচ্চ শক্তিশালী অস্ত্র, যার আঘাতে অনেক দূর থেকে শত্রুর ঘাঁটি অতি সহজে গুঁড়িয়ে দেওয়া যেত। বর্তমানে টিকা আবিস্কৃত ইয়োলো ফিভার ১৮ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধরা পড়লে তদন্তে প্রমাণিত হয় একটি হোটেল থেকে এই জ্বর ছড়িয়েছে। যুদ্ধ ফেরত সেনাদের সেই হোটেলটি কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত সেই ঘটনা থেকেও শিরোনামের বাক্যটির প্রচলন হয়েছে।

আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী ভেবে মশাকে তুচ্ছ বা অবহেলা করে ভাবেন যে, একটি ছোট্ট পতঙ্গের কি এমন ক্ষমতা আছে যারা আমাকে ঠেকাতে পারবে। তবে তাদের সাথে একটা রাত কাটানোর চেষ্টা করুন। আপনি তাদের অত্যাচারে রাতে ঘুমাতে পারবেন না এবং তাদের ডানার গুঞ্জন, জ্বালাময় কামড় ও সবখানে উপস্থিতি আপনাকে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিবে।

ছোট্ট মশা অত্যন্ত ভয়ংকর, প্রাণঘাতি ও শক্তিশালী কীট পতঙ্গ। পৃথিবীর শুরু থেকেই ৩৫০০ প্রজাতির মশা বীরত্বের সাথে আজও টিকে আছে। মশা কিন্তু অনর্থক সৃষ্টি নয় এবং নগণ্যও নয়। কিছু কীট পতঙ্গ, পাখি মশা খেয়ে এবং মশার ডিম মাছেরা খেয়ে বেঁচে আছে। পৃথিবীতে খাদ্য শৃঙ্খল এবং পরিবেশের ভারসাম্য এভাবেই বজায় আছে। আমাদের দেশেই এ পর্যন্ত ১২৬ প্রজাতির মশা শনাক্ত হয়েছে, তবে রাজধানী ঢাকাতেই আছে ১৪ প্রজাতির।

পরিসংখ্যান বলছে, সবচেয়ে বেশি মানুষ পৃথিবীতে মারা যায় মশার কামড়ে প্রায় ১০ লক্ষ, দ্বিতীয়ত ম্যনুষের হাতে খুন হয় প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সাপ।

মশার লাইফ স্টাইল বড্ড বৈচিত্রময় এবং রীতিমত বিস্ময়কর। মশার দাঁত ৪৮টি, পাখা ৬টি, পা ৮টি, চোখ ১০০টি, পৃথকভাবে ৩টি হার্ট এবং ২টি এন্টেনা আছে। রাতের আঁধারে ৭০ ফুট দূর থেকে শিকার করতে পারে। চেতনা নাশক অংশ দিয়ে তারা মানুষের রক্ত নেওয়ার অংশটুকু অবশ করে ১টি শুড় দিয়ে রক্ত চুষে নেয়। বিশুদ্ধ, গরম মানে তাজা রক্ত মশারা খেয়ে থাকে। রক্তের গ্রুপ ম্যাচ না হলে সেই রক্ত তারা গ্রহণ করে না। রক্তের ভালোমন্দ বোঝার মহাক্ষমতা তাদের আছে। মশার উড়ার গতিবেগ ঘন্টায় এক থেকে দেড় মাইল এবং মিলনের সময় ৫ মিনিট। প্রতি সেকেন্ডে ৩০০-৬০০ বার তারা ডানা ঝাপটাতে পারে ফলে বিরক্তি বা কুৎসিত শব্দ গুণগুণ শুরু হয়। কেউ কেউ প্যানপ্যানানি বা ঘ্যানঘ্যানানি বলে। পুরুষ মশা ১ সপ্তাহ এবং স্ত্রী মশা ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচে। পুরুষ মশা কেবলমাত্র গাছের রস এবং ফুলের মধু পান করে। সে সময় ফুলের পরাগায়ণ ঘটে। স্ত্রী মশারাই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রতিবারই ১০০-৩০০ ডিম পাড়ার আগে তাদের প্রচুর পুষ্টির প্রয়োজন হয়। রক্তপানের মাধ্যমেই সেই পুষ্টি পূরণ হয়। রক্ত শোষণ মশার জীবন চক্রেরই অংশ। মশা ২০টির মতো রোগ ছড়ায় যেগুলো হলো ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর (ইয়োলো ফিভার), ফাইলেরিয়া, জিকা ভাইরাস ও জাপানিজ এনকেফালাইটিস ইত্যাদি।

মশা নিয়ে গ্রীক লোককথা 'হাতি ও মশা' গল্পে দেখা যায় ছোট্ট একটা মশা হাতির শুড়ঁ দিয়ে মগজে ঢুকে তাকে কামড়ে পাগল করে তুলেছিল। ধর্মীয় আলোচনা বা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি অতিক্ষুদ্র একটি ল্যাংড়া মশা তৎকালীন বিশ্বে প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী বাদশাহ নমরুদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মাথার মগজে নিয়মিত আঘাত করে তাঁকে নাকানিচুবানি খাওয়ায়। অবশেষে আতংকজনক এই মশার কাছে তাঁর জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভে যায়। দুনিয়া কাঁপানো ইতিহাসের সেরা ও সফল সেনানায়ক মহাবীর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দুঃসাহসিক নাবিক ভাস্কো দা গামা, নতুন দেশ আবিস্কারক আমেরিগো ভেসপুজি, জগৎবিখ্যাত কবি লর্ড বায়রন, আদি কবি দান্তে, লেখক মাস্ক মুলার, ডেভিড লিভিংস্টোন, রোমান সম্রাট ৫ম হেনরি ও ৩য় অটোমান সম্রাটসহ অনেক রথি-মহারথি, রাজা-বাদশাহ, খ্যতিমান ধনকুবের মশার কামড় খেয়ে মৃত্যুর হিমশীতল ছায়াতলে ঢলে পড়েন।

রোগতত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট সূত্রে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি এ মৌসুমে যেসব মশা আছে তার ৯৯ শতাংশই না-কি কিউলেক্স মশা।

[পরবর্তী অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ভূস্বর্গ কাশ্মির নাকি স্কটল্যান্ড?

–প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

বাল্যকালে পড়েছি ও জেনেছি পৃথিবীর ভূস্বর্গ হলো কাশ্মির। বড় হয়ে কাশ্মির দেখার সুযোগ হয়েছে –আলহামদুলিল্লাহ। কাশ্মিরের অবস্থান হচ্ছে ১৫০০ মাইল (২৪০০ কিলোমিটার) দীর্ঘ হিমালয় পর্বতের পশ্চিম-উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে। হিমালয়ের প্রস্থ হলো উত্তর-দক্ষিণে ১২৫-২৫০ মাইল (২০০-৪০০ কি.মি.)। এর উপরে উত্তর পার্শ্বে তিব্বত আর দক্ষিণ পার্শ্বে নেপাল, ভূটান ও ভারতের সিকিম। পর্বতটি কাশ্মির ছাড়িয়ে আফগানিস্তানের বর্ডার ছুই ছুই অবস্থা থেকে পূর্ব দিকে ভূটান ছাড়িয়ে মায়ানমার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত।

কাশ্মির দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রবন্ধ লিখেছি এবং আমার রচিত ভ্রমণের বই– দেশ-বিদেশের সাতকাহন-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি। উক্ত বইটিতে নেপাল সফরের খুটিনাটি কাহিনীও লিখেছি।

এবার স্কটল্যান্ড দেখে অভিভূত হয়েছি। মনের মধ্যে প্রশ্ন ঘুর ঘুর করতে লাগল ভূস্বর্গ কাশ্মির না স্কটল্যান্ড? সফরটা শুরু হলো– আমি ও আমার স্ত্রী রৌশন আরা বেগম সিদ্ধান্ত নিলাম লন্ডন যাবার পথে মক্কায় 'উমরাহ্ করার। সে মতে বিগত ১৬.০৭.২০২৫ তারিখে আমরা উভয়ে সৌদিয়া উড়োজাহাজে বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা বিমান বন্দরে যাই। পূর্ব থেকেই হোটেল ও গাড়ি বুকিং দিয়ে রেখেছিল লন্ডনে বসবাসরত আমাদের বড় মেয়ে ডা. জুলফিয়া জেরীন। ফোনে যোগাযোগ করে বুকিং করা গাড়িতে আমরা মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার-এর ফিয়ারমন্ট হোটেলে উঠলাম। উল্লেখ্য যে, এই টাওয়ারে মোট ৭টি ফাইভ স্টার হোটেল আছে তার মধ্যে ফিয়ার মন্ট একটি। হোটেলটিতে ৩ বেলাই বুফে/বাফেট (Buffet) নিয়মে বাহারি খাবারের আয়োজন করে রাখা হয়। মক্কা ক্লক টাওয়ারের ডেভেলপার ও নির্মাণে ছিল বিন লাদিম গ্রুপ এবং ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময় লাগে এটা শেষ করতে। এখানে ১২৩টি তলা আছে যার ৩টি তলা মাটির নিচে এবং ১৬৫০টি রুম এবং তার সাথে অফিস ও মার্কেট।

* *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।*

আরব বিশ্বে এর চেয়ে উঁচু টাওয়ার হলো দুবাইতে অবস্থিত যার নাম বুর্জ খালিফা। ঐটা নির্মাণ শুরু হয় ২০০৪ সালে এবং শেষ হয় ২০১০ সালে। ডেভেলপার ছিল দুবাইয়ের ইমার প্রপারটিস আর নির্মাণে ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং কোম্পানি। ঐটাতে ১৬৩ তলা আছে এবং কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

মক্কা ক্লক টাওয়ারের ফেয়ারমন্ট হোটেলের ৪৫তম তলায় একটি রুমে আমাদের লাগেজগুলো রেখে ১২তম তলায় গেলাম হোটেলের রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবার খেতে। ডিনার শেষে আমরা ২ জন নিকটেই হারামের কাবার চত্বরে গেলাম 'উমরাহ্'র জন্য ৭ চক্রের তাওয়াফ করতে। তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রা-হীম বরাবর সামান্য একটু দূরে ২ রাক'আত সলাত আদায় করে গেলাম সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার সাঈ' করতে। সাঈ' শেষে যম্যমের পানি প্রচুর পান করলাম এবং মুখে ও মাথায় মাখলাম। রাত তখন আড়াইটা। সেলুনে যেয়ে মাথা ন্যাড়া করলাম। রাত সাড়ে তিনটায় তাহাজ্জুতের আযান হলো পরে সারে চারটায় ফজরের আযান হলে জামা'আতে অংশ গ্রহণ করে অতঃপর ক্লক টাওয়ারের হোটেলে রুমে যেয়ে গোসল শেষ করে ক্লান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে ঘুমালাম। সকাল ৯টায় উঠে নাস্তার জন্য হোটেলের রেষ্টুরেন্টে গেলাম বুফে/বাফেট সিস্টেমের বাহারি নাস্তা সাজানো আছে সেগুলো থেকে পছন্দমতো উঠিয়ে নিয়ে আমরা ২ জন খেলাম। আমরা ঐ হোটেলে ৩ রাত ছিলাম। হোটেলের প্রতিটির রুমে লাউড স্পীকার আছে এর মাধ্যমে ৬ ওয়াক্তের হারামের আযান (তাহাজ্জুদের আযানসহ) শুনা যায়। দুর্বল ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ রুমে থেকেও ইমামের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, ১৮ তলায় একটি বড় ফ্লোর কার্পেটিং করা আছে এবং সেখানে বহু কুরআন ও ছোট আকারে ভাজ করা স্টীলের চেয়ার (কুরসি) রাখা আছে। এখানে হারামের ইমামের সাথে বহু লোক (পুরুষ ও নারী) জামা'আতে সলাত আদায় করতে পারেন। আমরাও এক ওয়াক্ত ঐখানে সামিল হয়েছিলাম। ফ্লোরটির কিবলা দিকের দেয়াল কাঁচের, বিধায় কাবা ও হারামের মসজিদ দেখা যায়।

তিনদিন পর বুকিং করা গাড়িতে সারে চার ঘন্টায় ৫০০ কি.মি. রাস্তা অতিক্রম করে মদীনায় যাই এবং পূর্ব নির্ধারিত যম্যম পোল ম্যান হোটেলে উঠি। হোটেলটিও মক্কার ক্লক টাওয়ারের অধিনস্থ এবং মসজিদুন নব্বীর অতি নিকটেই

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কিবলার দিকে। এখানে তিনদিন অবস্থান করার পর গাড়িতে আবার সারে চার ঘন্টা চলার পর জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছি। সৌদিয়া উড়োজাহাজে ৬ ঘন্টা আকাশ পথ অতিক্রম করে হিত্রু বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশন শেষে লাগেজ-পত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে এলে প্রথমে নজর পরল নাতী জাইয়ান দেওয়ান আবেদীন, সাথে তার মা ডা. জুলফিয়া জেরীন ও পিতা ব্যারিষ্টার জয়নাল আবেদীন। তারা লন্ডন শহরে উত্তর-পশ্চিম এলাকা হ্যারুতে থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ১৬% মুসলিম এই হ্যারুতে আছে। অথচ সারা লন্ডনে আছে ১৫% মুসলিম এবং ইউনাইটেড কিংডম (ইউ.কে) যাকে গ্রেট বৃটেন (সংক্ষেপে বৃটেন) বলে মুসলিমের সংখ্যা ৬.৫%।

ইউনাইটেড কিংডম হলো রাজনৈতিকভাবে যুক্ত ৪টি দ্বীপগুলো– ইংল্যান্ড + স্কটল্যান্ড (ইংল্যান্ডের উত্তরে) + ওয়েলস (ইংল্যান্ডের পশ্চিম তীর ঘেষে) + উত্তর আয়ারল্যান্ড (ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের পশ্চিমে এবং আইরিশ সাগরেরও পশ্চিমে)। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড একটি স্বাধীন বড় দেশ নাম হলো রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড। অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেন হলো ভৌগলিকভাবে যুক্ত ৩টি দ্বীপ– ইংল্যান্ড + স্কটল্যান্ড + ওয়েলস। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন যা পুরো ইউ.কে'র রাজধানী অর্থাৎ- গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী।

ব্রিটেন বা ইউ.কে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। উত্তরে হলো স্কটল্যান্ড রাজ্য যার রাজধানী এডিনবরাহ (Edinburgh উচ্চারণ এডিন বার্গ নয় বরং এডিনবরাহ)। এখানে ৯০০ দ্বীপ আছে যার বেশিভাগ দ্বীপে মানুষ বসবাস করে না। দক্ষিণে ইংল্যান্ড– সবচেয়ে বড় রাজ্য ও বেশি জনসংখ্যা, যার রাজধানী হলো লন্ডন। এই লন্ডন হলো ব্রিটেনের বা ইউ.কে'র রাজধানী। ইংল্যান্ডের পশ্চিম-উত্তরে এবং স্কটল্যান্ডের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আয়ারল্যান্ড, যার রাজধানী হচ্ছে বেলফান্ট। ইউ.কে বা ব্রিটেন থেকে এ রাজ্যটি পৃথক হয়েছে আইরিশ সাগর দ্বারা। ইংল্যান্ড রাজ্যের পশ্চিমের রাজ্যটি হলো ওয়েলস যার রাজধানী কারডিফ।

স্কটল্যান্ড যাত্রা : লন্ডনে ১ সপ্তাহ অবস্থান করে আমরা ৫ জন লন্ডন থেকে সোয়া এক ঘন্টা আকাশ পথে স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরাহ বিমান বন্দরে পৌঁছি। স্কটল্যান্ডের স্টার লিংক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছর পূর্বে পিএইচডি করতে গিয়েছে গাজীপুরের সালনায় অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস বিভাগের শিক্ষক এবং একই জেলার পিরুজালী গ্রামের সন্তান ইব্রাহীম রশীদ। গাজীপুরস্থ পিরুজালী ইউনিয়নের বকচর পাড়ার নিবাসী আব্দুর রশীদের ছেলে হলো ইব্রাহীম। ইব্রাহীমের স্ত্রীও ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তিনি গেছেন ১ কন্যা সন্তানসহ জাপানে পিএইচডি করতে। ইব্রাহীমের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন হয়ে গেছে এবং কনভোকেশনের মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বর-২০২৫-এ সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ। তার সাথে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল এবং সে এয়ারপোর্টে আমাদেরকে রিসিভ করল। তাকে নিয়ে আমরা স্টারলিং (Stirling) শহরে আগেই বুকিং করা হোটেলে গেলাম, কারণ ইব্রাহীম ঐ শহরে থাকে।

স্কটল্যান্ডের প্রধান প্রধান কয়েকটি শহরের নাম হলো–

(১) গ্লাসগো (Glasgow) –এটিই সবচেয়ে বড় শহর দেশটির পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখান থেকে টাঙ্গাইলের আমার ভাগিনা ড. জহির রায়হান পিএইচডি করে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসী বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছে।

(২) ইডিনবরাহ রাজধানী শহর। স্কটল্যান্ড রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

(৩) ডানডী (Dundee) রাজ্যটির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এবং পাট ও পাট শিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

(৪) স্টারলিং (Stirling) ছোট শহর হলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে (১২তম শতকে) স্কটল্যান্ডের রাজা ও সেনাপতি রবার্ট দ্যা ব্রুইস (Robert The Bruice) ব্রিটিশ রাজার সাথে যুদ্ধ করে হেরে যেয়ে স্টারলিং শহরের কাছে এক গুহায় পালিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ঠাণ্ডা ও স্যাতস্যাতে গুহায় থাকা অবস্থায় একদিন গুহার মুখে রবার্ট ব্রুইস দেখতে পেল যে, একটি মাকড়শা জাল বুনাতে যেয়ে বার বার পরে যাচ্ছে। যতবার মাকড়শা পরে যাচ্ছিল ততবার উঠে আবার জাল বুনাতে (ঘর বানাতে) চেষ্টা করছিল। এভাবে ৭ বার মাকড়শা চেষ্টা করে নিজের ঘর (জাল) বুনাতে সক্ষম হলো। রবার্ট চিন্তা করলো মাকড়শা বার বার পরে যেয়েও চেষ্টা করে উঠে আবার জাল বুনতে থাকে। সুতরাং যুদ্ধে হেরে গেলেও সে মাকড়শা থেকে শিক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলো গুহা ত্যাগ করে আবার যুদ্ধ করতে। অতঃপর গুহা থেকে বেরিয়ে রবার্ট যুদ্ধ করতে থাকলো এবং ব্রিটিশ রাজাকে পরাজিত করতে সক্ষম হলো। এতে প্রমাণিত হয়, "একবার না পারলে দেখো বার বার"। গল্পটি আমরা স্কুলে বাংলা ও ইংরেজীতে

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

পড়েছি। ইব্রাহীম আমাদেরকে সেই গুহাটি দেখালো। গুহার উপরে যাতায়াতের জন্য ব্রিজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মাকড়শার নামে একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যার নাম সূরা আল-'আনকাবূত (মাকড়শা), ২৯ নং মাক্কী, ৬৯টি আয়াত। রাসূল (ﷺ) নবুওয়াতের প্রাক্কালে হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আবার মদীনায় হিজরতে শুরুতে সওর পাহাড়ের গর্তে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে ৩ দিন-রাত অবস্থান করেছিলেন (লুকিয়ে ছিলেন)। আবার পবিত্র কুরআনে গুহার নামে একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যার নাম সূরা আল-কাহ্ফ (গুহা), ১৮ নং মাক্কী, ১১০টি আয়াত।

(৫) আবারদীন (Aberdeen) –এটা হলো রাজ্যটির পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত উপকূল এলাকা।

(৬) ইনভারনেস (Inverness) উত্তর দিকে অবস্থিত এলাকা।

(৭) পার্থ (Perth) মধ্য স্কটল্যান্ড এলাকা।

প্রত্যেকটি শহরে নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা।

গ্রেট ব্রিটেনে (ইউ.কে) ৪টি ঋতু বিদ্যমান। যথা-

(ক) বসন্তকাল (Spring) : মার্চ থেকে মে পর্যন্ত। রোদ, বাতাস ও গরম শুরু হয়। ফুল ফুটতে থাকে। ভেড়ার উৎপাদন বেড়ে যায়।

(খ) গ্রীস্মকাল (Summer) : জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত। দিন বড়, রাত ছোট, সবুজ পাতা, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় সমৃদ্ধ থাকে। গরম আবহাওয়া।

(গ) শরৎকাল (Autumn) : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। শীত শুরু হয়। গাছ থেকে পাতা ঝরতে থাকে।

(ঘ) শীতকাল (Winter) : ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। দিন ছোট, রাত বড়। গুরি গুরি বৃষ্টি, আকাশ মেঘলা থাকে, সূর্য দেখা যায় না, বাতাস বেশি প্রবাহিত হতে থাকে।

ফিরে আসি স্কটল্যান্ডে– মহান আল্লাহর ইচ্ছায় দেশটি ভূপ্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্য বলে প্রতিয়মান হয়। টিলা, পাহাড়, হ্রদ, বিল, খাল, নদী, বন প্রভৃতি দ্বারা অপরূপভাবে কে যেনো সাজিয়েছে! রাস্তায় বেরুলে মনে হয় এই মাত্র রাস্তা-ঘাট সবগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। চক চক, ঝক ঝক পরিবেশ দেখার মতো। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোথাও কোনো যানবাহনের হর্নের শব্দ শুনা যায় না, সর্বত্রই নিরবতা। মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনে দেখেছি আমাদের অনেক শিক্ষকের নাম ফলকে লেখা থাকত ডিগ্রীগুলোর পরে ব্যাকেটের ভিতরে গ্লাসগো, এডিনবরাহ, স্টারলিং, ডান্ডী ইত্যাদী।

স্কটল্যান্ডের ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়েছি। মনে মনে ভাবছি তাহলে ভূস্বর্গ কাশ্মির না স্কটল্যান্ড? ছোটকালে পড়েছি কাশ্মির হলো পৃথিবীর স্বর্গ। দেখে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু এবার স্কটল্যান্ড দেখে ভাবনাটা পরিবর্তন হলো। ইব্রাহীম তার বিশ্ববিদ্যালয় (Stirling University) ঘুরে ঘুরে দেখালো। ক্লান্ত হয়ে পুকুরের পাড়ে বসার স্থানে আমরা বিশ্রাম নিলাম। বিশাল জায়গা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। বন, খাল, বিল, খালের উপর ব্রিজ, টিলা, পাহাড়, খেলার মাঠ, জুমু'আহ্ ও ওয়াক্তের সলাতের জন্য প্রেয়ার কক্ষ (মসজিদ), ক্যান্টিন ইত্যাদি শোভা পাচ্ছে। স্টারলিং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে হলো বিলেতের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়কে পরিবেশগতভাবে হার মানিয়েছে। ড. ইব্রাহীম (স্টারলিং থেকে পিএইচডি করা) ও ড. জহির রায়হান (গ্লাসগো থেকে পিএইচডি করা) উভয়ের কাছে জানতে পেরেছি স্কটল্যান্ডের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগলিক পরিবেশ অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং পড়ালেখা-গবেষনায় বিশ্বের মধ্যে সেরাদের অন্তর্ভুক্ত। স্কটল্যান্ডের ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ সাজানো-গোছানো ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং, রাস্তা-ঘাট, শপিংমল, রেস্টুরেন্ট, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, দোকান প্রভৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

ইব্রাহীমকে নিয়ে আমরা ৬ জন স্টারলিং শহরের বাইরে চতুর্দিকে পাহাড়, বন পরিবেষ্টিত বিশাল হ্রদটিতে অন্যান্য টুরিস্টদের সাথে নৌবিহারে যাই। বিরাট জাহাজের ২য় তলায় থেকে ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো মন আকৃষ্ট করে। তাছাড়া স্কটল্যান্ডের যেখানে যাবার সুযোগ হয়েছে, দেখেছি নানান রং-বেরং-এর পাতা বিশিষ্ট গাছ-পালা, ফুল ও ফলের বাহারি রং ইত্যাদি দেখে অভিভূত হয়েছি। সমতল ভূমিতে প্রচুর ঘাসের ময়দানে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতির বিচরণ ছিল লক্ষণীয়। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল তাই সূর্যের আলোতে ফুল, ফল ও পাতাগুলো সজীব হয়ে বাতাসে নাচতে থাকে। পাখীর কলরব শুনে মুগ্ধ হয়েছি, তারা পানিতে আনন্দের সাথে চেচামেচি করছে। খাল, বিল, নদ-নদী, হৃদ প্রভৃতির পানির স্বচ্ছতা দেখে কে না মুগ্ধ হবে? আমাদের দেশের পানিগুলো মিল, কল-কারখানার বর্জ দ্বারা বিনষ্ট হয়ে দুর্গন্ধময় হয়ে থাকে। তাছাড়া আমরা পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ পদার্থ দিয়ে আমাদের নদীমাতৃক ও শস্য-শ্যামল প্রিয় দেশটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ঐতিহ্যের পথ ধরে তারুণ্যের জয়যাত্রা : জমঈয়ত শুব্বানের সুদীর্ঘ পথচলা

–মুস্তাফিজুর রহমান মাসুদ*

আঁধার ফুঁড়ে আলোর রেখা ফোটে, আর সেই আলোর কণাগুলোই একসময় সুবিশাল সূর্যের রূপ দেখায়। তেমনি ১৯৪৬ সালে বাংলার জমিনে যে তাওহীদের মশাল জ্বেলেছিলেন দূরদর্শী আলেম ও মহান সংস্কারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ), সেই মশালেরই এক উজ্জ্বল শিখা হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। এটি কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি এক স্বপ্ন, এক প্রত্যয়, এক দীর্ঘ পথচলার অবিচ্ছিন্ন উপাখ্যান। আজ যখন এই তারুণ্যদীপ্ত কাফেলা তাদের ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, তখন স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে এর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, প্রতিটি বাধা-বিপত্তির কাহিনী, আর ভবিষ্যতের জন্য বুনে রাখা সীমাহীন স্বপ্নগুলো। এটি কেবল একটি প্রবন্ধ নয়, এ যেন এক প্রেমিকের হৃদয়ের নিংড়ে দেওয়া কথামালা, যেখানে প্রতিটি শব্দে মিশে আছে ভালোবাসা আর ত্যাগ।

১. প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : অঙ্কুর থেকে মহীরুহ– জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না; বরং তা ছিল একটি গভীর চিন্তাভাবনা, একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনের ফসল। এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর এক বিশাল ও মহৎ ঐতিহ্যের গভীরে। বাংলার জমিনে যখন শির্‌ক, বিদ'আত আর কুসংস্কারের মেঘ ঘনীভূত হয়ে দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছিল, তখন ১৯৪৬ সালে আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) সাহেব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নির্ভেজাল বাণী প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল অপরিসীম। তিনি বুঝেছিলেন, একটি জাতির মেরুদণ্ডকে সোজা করতে হলে, তাকে তার শেকড়ের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে– অর্থাৎ- সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

তবে, যে কোনো মহৎ আন্দোলনের সফলতার জন্য প্রয়োজন হয় তারুণ্যের দৃপ্ত অংশগ্রহণ। যুবশক্তি ছাড়া কোনো বিপ্লবই সফল হয় না। কাফী সাহেব ও তার উত্তরসূরিরা উপলব্ধি করলেন যে, মূল সংগঠনের দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও সম্প্রসারিত করতে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মনন ও মেধা বিকাশে একটি স্বতন্ত্র যুব সংগঠনের গুরুত্ব অপরিহার্য। এই ভাবনা থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের ধারণা। মূল সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতিকে নিজেদের বুকে ধারণ করে, কিন্তু নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলার প্রত্যয় নিয়েই একঝাঁক উদ্যমী তরুণের হাতে গড়ে ওঠে এই সংগঠন।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনগুলো ছিল যেন চারাগাছের অঙ্কুরোদগমের মতো। সামান্য পুঁজি, অফুরন্ত উদ্যম আর অদম্য ঈমানী শক্তি ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত, সর্বত্র তারা তাওহীদের দা'ওয়াত নিয়ে ছুটে গেছেন। তরুণদের একত্রিত করা, তাদের মাঝে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে একটি আদর্শিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এই সময়টায় প্রতিটি সদস্য ছিলেন যেন এক একজন নিরলস সৈনিক, যারা শুধু নিজেদের জন্য নয়; বরং উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এভাবেই বিন্দু বিন্দু করে গড়ে ওঠে জমঈয়ত শুব্বানের প্রথম বুনিয়াদ। প্রতিটি ইট, প্রতিটি পাথরে লেগে ছিল তাদের মেধা, শ্রম আর আন্তরিকতার পরশ।

২. উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি : পথচলার মাইলফলক– একবার যাত্রা শুরু হলে আর ফিরে তাকানোর সুযোগ থাকে না। প্রথম দিকের সেই ক্ষুদ্র পরিসর থেকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। একটি চারাগাছ যেমন ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি এই সংগঠনও তার কর্মপরিধি এবং প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সমৃদ্ধি এসেছিল ধারাবাহিকতা, সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা এবং কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ।

দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিস্তার : জমঈয়ত শুব্বানের সবচেয়ে বড় অর্জনগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিশাল বিস্তার। তারা শুধু শহরে নয়, প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলেও দা'ওয়াতের বার্তা নিয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে আয়োজিত অসংখ্য ইসলাহী মাহফিল, তারবিয়াহ ক্যাম্প, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে, যুবকদের লক্ষ্য করে আয়োজিত কর্মশালাগুলো তাদের মনে বিশুদ্ধ ইসলামী 'আক্বিদার বীজ বুনে দিয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো মানুষকে শির্‌ক-

* মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিদ'আতমুক্ত একটি জীবনযাপনের দিকে আহ্বান জানিয়েছে, যা জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছে।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় অবদান : সংগঠনটি কেবল মুখস্থ দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তারা নিয়মিতভাবে তাফসীরুল কুরআন ও দরসে হাদীসের আয়োজন করে, যেখানে দেশের প্রথিতযশা উলামায়ে কিরামগণ বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করেন। যুবকদের মধ্যে গবেষণা ও অধ্যয়নের আগ্রহ তৈরি করতে বিভিন্ন সেমিনার ও পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন মাদ্‌রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তারা শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জ্ঞানকে তারা জাহেলিয়াত দূর করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখেছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিস্তার : প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুব্বান একটি সুসংগঠিত কাঠামো গড়ে তুলেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোর মাধ্যমেই তারা তাদের কার্যক্রমকে সুসংহত করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। নিয়মিত কর্মী সমাবেশ, কাউন্সিল এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে দক্ষতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সংগঠনের গতিশীলতা নিশ্চিত করেছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তাদের প্রভাবের পরিধিকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রকাশনা ও মিডিয়া : জ্ঞান প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলো প্রকাশনা। জমঈয়ত শুব্বান এই ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেনি। নিয়মিত স্মরণিকা, মাসিক পত্রিকা (মাসিক তর্জুমানুল হাদীস) এবং বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তারা ইসলামী জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করেছে। আধুনিক যুগে এসে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে, যা দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে আরো দ্রুত এবং বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। এটি ছিল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এক সাহসী পদক্ষেপ।

সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম : শুধুমাত্র ধর্মীয় দা'ওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, জমঈয়ত শুব্বান বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে তারা সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়েছে। পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো –এসব মানবিক কাজও তাদের কর্মতালিকায় স্থান পেয়েছে, যা সমাজের কাছে তাদের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে।

৩. বাধা-বিপত্তি : পথের কাঁটা আর অদম্য প্রত্যয়– কোনো মহৎ কাজই বাধাহীনভাবে সম্পন্ন হয় না। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের সুদীর্ঘ পথচলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না; বরং তাদের এই জয়যাত্রা ছিল অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, ভুল বোঝাবুঝি এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরন্তর এক যুদ্ধ। এই বাধাগুলোই তাদের পরীক্ষা করেছে, তাদের ঈমানকে শানিত করেছে এবং তাদের প্রত্যয়কে করেছে আরো অদম্য।

প্রথমত, ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার : আহলে হাদীস মানহাজ যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহকে সরাসরি অনুসরণ করে এবং প্রচলিত অনেক রীতিনীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখে, তাই অনেক সময়ই তাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা অপপ্রচারের শিকার হতে হয়েছে। মৌলবাদ, চরমপন্থা বা বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ এনে তাদের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অপপ্রচারগুলো মোকাবেলায় শুব্বানের কর্মীরা ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং দলিলের মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। তারা বুঝেছিলেন, মিথ্যা একদিন অপসৃত হবেই, যদি সত্যের ওপর অবিচল থাকা যায়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ। সমাজের কিছু অংশের রক্ষণশীল মনোভাব এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক অস্থিরতাও তাদের কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। দা'ওয়াতী প্রোগ্রামে বাধা দেওয়া, সম্মেলন আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কর্মীদের হয়রানি করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু এসব চাপ তাদের মনোবল ভাঙতে পারেনি; বরং তারা আরো দৃঢ়তার সাথে নিজেদের লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তাদের কাছে ঈমানের মজবুত দেয়াল ছিল সবচাইতে শক্তিশালী আশ্রয়।

তৃতীয়ত, আর্থিক সীমাবদ্ধতা : একটি অলাভজনক সংগঠন হিসেবে, জমঈয়ত শুব্বানকে প্রায়শই আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। বিশাল আকারের কার্যক্রম পরিচালনা, প্রকাশনা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট তহবিলের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ও শ্রম দিয়ে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছেন। সদস্যদের ত্যাগ ও নিবেদনই ছিল তাদের প্রধান পুঁজি।

চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ : এত বড় একটি সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে মতপার্থক্য বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। নেতৃত্ব, কর্মপন্থা বা কৌশল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু জমঈয়ত শুব্বান সবসময়ই আলোচনা, পরামর্শ এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। তারা সবসময় ঐক্যের ওপর জোর

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

দিয়েছে এবং বিভেদকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাই তাদের শক্তি জুগিয়েছে।

পঞ্চমত, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ : একুশ শতকে এসে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব এবং তরুণদের বহুমুখী চাহিদা এক নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ভুল তথ্য ও ফিতনার বিস্তার, পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং যুবকদের মোবাইল আসক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের দা'ওয়াতি কার্যক্রমকে আরো জটিল করেছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শুব্বান নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে, যেমন- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়তা এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ।

এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কখনও তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি; বরং প্রতিটি বাধাই তাদের আরো শক্তিশালী করেছে, তাদের প্রত্যয়কে আরো মজবুত করেছে। তারা প্রমাণ করেছে, সত্যিকারের ঈমানী শক্তি এবং বিশুদ্ধ 'আক্বিদার ওপর ভরসা থাকলে কোনো বাঁধাই স্থায়ী হতে পারে না।

৪. বর্তমান কার্যক্রম : আলো ছড়ানো নিরন্তর প্রয়াস– জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ অতীতের অর্জনগুলোকে পাথেয় করে বর্তমানে এক গতিশীল ও বিস্তৃত কর্মযজ্ঞে লিপ্ত রয়েছে। তাদের বর্তমান কার্যক্রমগুলো শুধু ধর্মীয় দা'ওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ও যুব সমাজের মনন বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

দা'ওয়াত ও তারবিয়াহ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা : শুব্বান নিয়মিতভাবে সারা দেশব্যাপী দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুমু'আর খুৎবাহ্, সাপ্তাহিক ও মাসিক তাফসীরুল কুরআন এবং দরসে হাদীসের আয়োজন তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। বিশেষ করে, যুবকদের জন্য "তারবিয়াহ ক্যাম্প" ও "ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা" অত্যন্ত জনপ্রিয়, যা তরুণদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ তৈরি করে। এসব প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্ভুল বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

শিক্ষা ও গবেষণা : বর্তমান সময়ে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শুব্বান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে এবং ইসলামী শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে। তারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্টাডি সার্কেল ও সেমিনারের আয়োজন করে, যাতে তারা তাদের জ্ঞানকে আরো গভীর করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজেরও তারা সহযোগিতা করে থাকে, যা ইসলামী জ্ঞানকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

সামাজিক সংস্কার ও সচেতনতা : জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাদের স্লোগান কেবল মুখেই নয়, বাস্তবেও তারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। মাদক, ইভটিজিং, সাইবার ক্রাইম, অনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তারা যুবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে তারা দা'ওয়াতী কাজের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান তুলে ধরা হয়।

সাংগঠনিক শক্তিশালীকরণ : কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠনের কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তারা নিয়মিত কর্মী সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং কাউন্সিলিং সেশনের আয়োজন করছে। নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করা এবং পুরনো সদস্যদের সক্রিয় রাখা, উভয় ক্ষেত্রেই তারা কাজ করছে। নেতৃত্ব বিকাশের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যোগ্য নেতৃত্বে আসতে পারে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়তা : আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুব্বান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেইজ এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো দা'ওয়াতি কাজের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লেকচার, খুতবাহ্, শর্ট ভিডিও এবং ইনোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে তারা লাখো মানুষের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, যা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মানবিক ও সেবামূলক কার্যক্রম : শুব্বান শুধু ধর্মীয় দা'ওয়াত নয়, মানবিকতার ডাকেও সাড়া দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়) আক্রান্তদের ত্রাণ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, অসুস্থদের সহযোগিতা এবং অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কার্যক্রমও তারা পরিচালনা করে। এসব কাজ সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

আন্তঃসংগঠনিক সম্পর্ক : বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন এবং সামাজিক সংস্থার সাথে তারা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে তারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী এবং এজন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

জমঈয়ত শুব্বানের বর্তমান কার্যক্রমগুলো প্রমাণ করে যে, তারা কেবল অতীতের ঐতিহ্যের ধারক নয়; বরং বর্তমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে আলোর মশাল জ্বেলে দেওয়ার এক নিরন্তর প্রয়াস।

৫. ভবিষ্যতের স্বপ্ন : দিগন্তজোড়া সম্ভাবনা– একটি সংগঠন তখনই সফল হয় যখন তার চোখে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যখন তার পরিকল্পনাগুলো শুধু বর্তমানের জন্য নয়; বরং

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সুদূর ভবিষ্যতের পথও আলোকিত করে। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সুদীর্ঘ পথচলায় অসংখ্য অর্জনকে নিজেদের ঝুলিতে পুরেছে, কিন্তু তাদের চোখ এখন আরো সুদূরপ্রসারী, তাদের হৃদয়ে বুনো আছে দিগন্তজোড়া স্বপ্ন।

ক. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা : তাদের স্বপ্নের কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রকৃত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এমন একটি সমাজ যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানই হবে সকল প্রজ্ঞা ও বিদ্যার উৎস। এর জন্য তারা আরো বেশি মাদ্রাসা, ইসলামিক সেন্টার এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। তারা চায় প্রতিটি তরুণ যেন কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

খ. নৈতিক ও আদর্শিক যুবসমাজ গঠন : ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি আদর্শিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন যুবসমাজ তৈরি করা। শুব্বান চায় এমন এক প্রজন্ম যারা মাদক, অশ্লীলতা, সন্ত্রাসবাদ এবং সর্বপ্রকার অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে। তারা যুবকদেরকে ইসলামের প্রকৃত সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যারা সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এই জন্য তারা আরো কার্যকর তারবিয়াহ প্রোগ্রাম এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে যুবকদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে কাজ করতে ইচ্ছুক।

গ. প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার : ডিজিটাল যুগে এসে দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তারা উন্নতমানের ইসলামিক অ্যাপস তৈরি, অনলাইন লাইব্রেরি স্থাপন, আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি এবং ভার্চুয়াল কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিতে চায়। সোশ্যাল মিডিয়াকে তারা জ্ঞান বিতরণ ও ভুল ধারণার অপনোদনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঘ. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও কর্মসংস্থান : একটি শক্তিশালী সংগঠন হতে হলে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অপরিহার্য। শুব্বান শুধুমাত্র অনুদানের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার স্বপ্ন দেখে। পাশাপাশি, তারা যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন Vocational Training Program চালু করতে চায়। এর মাধ্যমে তরুণরা কেবল দ্বীনের খেদমতেই নয়; বরং অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হবে।

ঙ. সমাজকল্যাণ ও মানবসেবার প্রসার : মানবসেবা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জমঈয়ত শুব্বান তাদের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করতে চায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তারা আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায়। একটি মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা তাদের স্বপ্নের অংশ হতে পারে, যেখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থার সকল সুন্দর দিক বাস্তবায়িত হবে।

চ. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য : মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জমঈয়ত শুব্বান এই অনৈক্য দূর করে কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে সবাইকে একত্রিত করার স্বপ্ন দেখে। তারা চায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা যেন উম্মাহর চালিকাশক্তি হয়। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং বৈশ্বিক মুসলিম সমস্যা সমাধানে অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা তাদের রয়েছে।

ছ. বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াত : তাদের স্বপ্ন শুধু বাংলাদেশের সীমানায় আবদ্ধ নয়; বরং তারা চায় বিশ্বব্যাপী কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে। এই জন্য তারা আন্তর্জাতিক স্কলারদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, বৈদেশিক মিশনে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার পরিকল্পনা করছে।

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন হলো এই স্বপ্নের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এটি কেবল অতীতের অর্জনকে স্মরণ করা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে প্রতিজ্ঞা করার একটি দিন। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের এই সব স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। এই তারুণ্যের জয়যাত্রা কেবল সুদীর্ঘ পথচলা নয়, এটি এক অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা, যা ইসলামের সোনালী দিগন্তকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবে।

উপসংহার : ঐতিহ্যের পথ ধরে তারুণ্যের এই জয়যাত্রা, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের প্রতিটি পদক্ষেপে এক নতুন ইতিহাস রচনা করছে। ১৯৪৬ সালের সেই দূরদর্শী প্রজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের এই তারুণ্যের উদ্দীপনা পর্যন্ত, এই সংগঠন প্রমাণ করেছে যে, দৃঢ় সংকল্প, নিরলস পরিশ্রম এবং মহান আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাস থাকলে সকল বাধা অতিক্রম করে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। এই ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন যেন সেই প্রতিজ্ঞারই নবায়ন। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন ও সুন্নাহর এই নির্ভুল পতাকাতলে একত্রিত হয়ে জমঈয়ত শুব্বান আগামী দিনেও জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ ভেঙে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো ছড়িয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ এবং আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং ভবিষ্যতের এই স্বপ্নযাত্রা বরকতময় করুন –আমীন। ☒

কবিতা

উদাসীন

মো. আব্দুল্লাহ বিন জাকির (জুবায়ের)*

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি ঘুরে ফিরি দিগদিগন্ত,
আমি ভীতু, নির্জীব, অকর্ম
আমি নিষ্ঠুর, নৃশংস।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি বেপরোয়া, নিন্দিত কান্ত,
আমি মন্থর, অমার্জিত প্রাণ
অমনোযোগী, অসংলগ্ন টান।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি বিশ্বাসহীন, অসত্য প্রান্ত,
আমি অমূলক প্রসঙ্গধারী
আমি ক্রোধে রোষান্বিত ভারী।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি অস্তিত্বে অশান্ত,
আমি প্রজ্ঞায় ভীষণ নগণ্য
আমি কুৎসিত, কদর্য দহন।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি নিরর্থক, অকৃতকার্য ভ্রান্ত,
আমি অপ্রতুল, তুচ্ছ, ক্ষয়মান
আমি উন্মাদ, রুগ্ন প্রাণ।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি আশাহীন, বাউণ্ডুলে ক্লান্ত,
আমি পাষণ্ড, তির্যক অন্তর
আমি অশ্রুসিক্ত, পরাভূত অন্তর।

তবু এই আঁধার ক্ষীণ আলো জ্বলে
ভোরের সূর্য ডাকে নতুন ছলে,
আমি উদাসীন, তবুও খুঁজি নতুন গান
অন্ধকার ভেদে উঠুক সতেজ প্রাণ।

বোঝা বিষমদায়

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

নারী নেতৃত্ব হারাম বলে
করল যারা মাঠ গরম
আজকে তারাই নারীর দোসর
কোথায় গেল লাজ শরম!
ভাস্কর্য ভাঙ্গতে যারা
লড়ল শক্ত হাতে
আজকে তারাই সেলফি তোলে
ভাস্কর্যের সাথে!
ক'দিন আগে রাজা-রানি
ছি! ছি! দিলো যাকে
আজকে আবার আদর করে
বুকে নিলো তাকে!
ঈমানটা খুব বাড়ে-কমে
কখনো হয় ধ্বংস
বাইরে দেখে বোঝা কঠিন
মুনাফিক্বের বংশ।
স্বার্থলোভে ঈমান 'আমল
হচ্ছে বেঁচা-কেনা
কেবা আসল কেবা নকল
যায় না মোটে চেনা!
ভেবে চিন্তে পা-বাড়িও
নেতা নেত্রীর ফাঁদে
কেঁদে কেটে লাভ হবে না
পড়লে নরকখাদে!

দুই রঙের নগর

আব্দুল্লাহ আল নূমান*

এক পাশে প্রাসাদ, ঝলমলে আলো,
গাড়ির কাচে রোদের জ্বালো,
সকালের শুরু বিদেশি কাপে,
হাসি যেন বাঁধা কৃত্রিম চাপে।

অন্য পাশে কাদা, ভাঙা পথঘাট,
পেটে না জুটে দু'মুঠো ভাত
কাজের ফলশ্রুতিতে ঠুসকা ভরা হাত,
স্বপ্নটাও যেন অর্ধেক রাত।

একজন চায় ছুটি সমুদ্র ধারে,
অন্যজন চায় ধোঁয়া রান্নাঘরে।
আকাশটা একই, বাতাসও একই,
তবু ভাগ্যের রঙে দূরত্ব টা-ই।

ধনী-গরিবের ব্যবধান ভারী,
হাসি কারো সোনা, কারো চোখে অশ্রুধারী।
তবু শহর বলে– "সবাই সমান",
কেউ দেখে উপরে, কে নিচে যান। [পরবর্তী কবিতা ৪৮ পৃষ্ঠায়]

*সহকারী কর্মকর্তা (প্রকাশনা), বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত।

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

*আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস সালফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, কোনাপাড়া, ফুরবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ্।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

জমঈয়ত সংবাদ

রাজশাহী বিভাগীয় জমঈয়তের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

গত ১৫ অক্টোবর বুধবার রাজশাহীর ওয়ারিশান হোটেলে রাজশাহী বিভাগীয় জমঈয়তের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় রাজশাহী বিভাগের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ও শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন, উপদেষ্টা শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমেদ প্রমুখ। এ সভায় বিভাগীয় জমঈয়তকে শক্তিশালীকরণ বিষয়ে উদ্যোগ গস্থহণ করা হয়।

খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

গত ১৭ অক্টোবর শুক্রবার, যশোরের বকচর আহলে হাদীস জামে মসজিদেয় খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তের শীর্ষ পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে, বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক শাইখ আহমদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহা. রেজাউল ইসলাম এবং তালীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নুরুল আবসার।

এ সভায় খুলনা বিভাগের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর বিভাগীয় জমঈয়তের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংবর্ধনা সভা

গত ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার রংপুর বিভাগীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যদের নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল যথাক্রমে শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন ও শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী। এ সভায় রংপুর বিভাগীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাই সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি জনাব মামদুহুর রহমান।

উত্তরখান এলাকা জমঈয়তের পরামর্শ সভা

উত্তরখান এলাকা জমঈয়তের পরামর্শ সভা গত ২৫ অক্টোবর শনিবার চামুরখান কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আনোয়ার হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মিডিয়া ও জনসংযোগ সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান, মহানগর উত্তর জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত, সহকারী সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। এ সভায় শাখা প্রতিনিধিগণ ১ নভেম্বরের সুধী সমাবেশ সফল করতে নিজ নিজ শাখার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক তৎপরতা

বিগত ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার বাদ মাগরিব হলিধানী কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. নাজিমুদ্দীন মাষ্টারের সভাপতিত্বে ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. ইব্রাহীমের উপস্থাপনায় মুহা. শহিদুল ইসলামের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি জনাব মুহা. আব্দুল জলিল খান, সহ-সভাপতি মুহা. ইয়াকুব আলী ও অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মুহা. খালেদ হাসান, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ঝিনাইদহ রাফসান টাওয়ারের মালিক মুহা. আক্তারুজ্জামান, হলিধানী ইলাকা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. রেজাউল ইসলাম, শাখা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মুহা. আসাদুজ্জামান ও হলিধানী কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের কোষাধ্যক্ষ মুহা. মোনাওয়ার প্রমুখ। ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি **“তাক্বওয়াভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয় ও বর্জনীয়”** বিষয় শীর্ষক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বাদ সালাতুল ‘ইশা জেলা জমঈয়তের সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দু’আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় সভাপতির রাজশাহী সফর সম্পন্ন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী ১৫, ১৬ ও ১৭ অক্টোবর (বুধবার, বৃহস্পতি ও শুক্রবার) রাজশাহী জেলায় তিনদিনব্যাপী সংগঠনিক ও দাওয়াতি সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেন। সফরকালে তিনি জেলা, উপজেলা ও শাখা দায়িত্বশীলদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, কাউন্সিল অধিবেশন এবং শাখা গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

প্রথম দিন– ১৫ অক্টোবর, বুধবার : সফরের প্রথম দিনে বাদ মাগরিব রানীবাজারে অবস্থিত রাজশাহী কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা মজলিসে কারারের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংগঠনের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও সময়োপযোগী করতে সবাইকে নিষ্ঠা ও একতা নিয়ে কাজ করতে হবে। এসময় তিনি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন এবং মাঠ পর্যায়ে দা'ওয়াতি কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় দিন– ১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় বাদ ফজর, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ-তে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে, তিনি তরুণ প্রজন্মকে সঠিক 'আক্বিদাহ্ ও আদর্শে গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, যুবকরাই জাতির ভবিষ্যৎ-তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

পরে সকাল ৯ টায় তিনি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার অন্তর্গত বাউসা হেদাতীপাড়ায় অবস্থিত দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সে শাখা গঠন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বিকাল ৪টায় একই অঞ্চলের মাদ্‌রাসা দারুস সালাম আস-সালাফিয়্যাহ-তে শাখা গঠন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। উভয় সভায় তিনি সংগঠনের লক্ষ্য ও দা'ওয়াতি কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সংগঠনের কাজ আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান।

তৃতীয় দিন– ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার : সফরের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী বাঘা উপজেলার বাউসা হেদাতীপাড়া দারুল হুদা সেন্ট্রাল মসজিদে জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন এবং সলাতের ইমামতি করেন। খুৎবায় তিনি ঈমান, 'আমল ও একতা বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

জুমু'আর সলাতের মাধ্যমে তার রাজশাহী সফরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়।

সফরজুড়ে কেন্দ্রীয় সভাপতির সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা শুব্বানের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা সফরকে ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সফরকে সফল করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার আয়োজিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জেলা দায়িত্বশীল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন রাজধানীর জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদীর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজীর সঞ্চালনায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে ৮টায় নাটোর জেলা শুব্বানের প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয শরিফুল ইসলামের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

দারসুল হাদীস পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সবচেয়ে এগিয়ে শুব্বানের তরুণরা। ভবিষ্যতে এই দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব

দেবে শুব্বানের কর্মীরা। তিনি সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

‘সংগঠন প্রতিষ্ঠা, সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

‘তাবলীগ ও তাযকীয়া : পৃথক নয়, সম্পূরক’ বিষয়ে আলোচনা করেন মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর-এর অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুন নূর বিন আবু সাঈদ মাদানী। ‘রিপোর্টিং ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পদ্ধতি’ বিষয়ে আলোচনা করেন– শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি মুহা.আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

দ্বিতীয় অধিবেশন জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক ও নাসিহামূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত জেলা দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ জেলার বিগত তিন মাসের কার্যক্রমের রিপোর্ট, আগামী তিন মাসের কর্মপরিকল্পনা, সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জেলা দায়িত্বশীল বৈঠকে দেশের ৩৭টি জেলা থেকে মোট ১৩০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কারারের বিভাগীয় দায়িত্বশীলবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী সকল জেলার দায়িত্বশীলদের খোঁজখবর নেন এবং অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এখান থেকে ফিরে প্রত্যেকে নিজ নিজ জেলায় সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় একটি করে আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অথবা দায়িত্বশীল কর্মশালার আয়োজন করবে। তিনি আরও বলেন, জমঈয়ত আমাদের পিতৃ সংগঠন; এর নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়ন করব। তিনি দাওয়াতি কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান এবং সকলের জন্য দু‘আ করেন। পরিষেশে দু‘আর মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মশালা ও বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাসিক আলোচনা সভার তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত

গত ১২ অক্টোবর রোজ রবিবার বাদ মাগরি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, নারায়নগঞ্জ জেলার উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভার তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চন উত্তর বাজার আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মাসজিদ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাইখ আবু আহমাদ আ. রহমান মাদানী, সঞ্চালনায় নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান-এর সাধারণ সম্পাদক শাইখ রমজান মিয়া। সভাপত্বিত করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ আ. রহমান মাদানী। প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ ড. শফিকুল ইসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্জ আব্দুস সালাম।

দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সে প্রথমবারের মতো শুব্বানের শাখা গঠন

গত ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সে প্রথমবারের মতো জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর শাখা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর নবনির্বাচিত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাইখ মুযাফফর বিন মুহসিন পরিচালিত দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার বাউসা হেদাতীপাড়ায় অবস্থিত। দারুল হুদা সেন্ট্রাল মসজিদে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মতো শুব্বানের পদচারণা শুরু হলো।

সকাল সাড়ে ১০টায় এ দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স এর ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুর রাজ্জাক এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উপস্থিত ছাত্র ও সুধীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন শাইখ ফজলুল হক মাদানী, আদ-দাওয়াহ ইন্সটিটিউট এর পরিচালক শাইখ মঈনুল ইসলাম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী, রাজশাহী জেলার সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল হাকীম

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মাদানী ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স এর মাননীয় প্রিন্সিপাল শাইখ ড. মুকাররম বিন মুহসিন মাদানী।

উপস্থিত সুধীবৃন্দের সিলেকশনের মাধ্যমে দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স শুব্বান শাখার দায়িত্বশীল নির্বাচন করা হয়। **নির্বাচিত কমিটির সদস্যগণ** নিম্নরূপ :

শাইখ হুসাইন- সভাপতি, শাইখ আরিফ আল আফী- সহ-সভাপতি, আহমাদ রফিক- সাধারণ সম্পাদক, নাঈম আহমাদ- যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস- কোষাধ্যক্ষ, আশিকুজ্জামান- সাংগঠনিক সম্পাদক, জুবায়ের বিন জামাল- প্রচার সম্পাদক, আহসান হাবীব- সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, আব্দুল হাসীব বিন শামসুল হক- ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, মুহিবুর রহমান- দফতর সম্পাদক, ফায়সাল আহম্মেদ- পাঠাগার সম্পাদক, আহমাদুল্লাহ- যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক, ইসমাইল বিন হারুন- মিডিয়া বিষয়ক দায়িত্বশীল, শায়খ মীযানুর রহমান- সদস্য, আহসান হাবীব বালাটারী- সদস্য।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শুব্বান রাজশাহী জেলার সভাপতি শাইখ আব্দুল মু'মিন, সহ-সভাপতি ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স এর মাননীয় ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আযহারুল ইসলাম মাদানী ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স এর শিক্ষকমণ্ডলী।

মিরপুর শুব্বানের আয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

রাজধানীর মিরপুরে "জমঈয়ত শুব্বান আহলে হাদীস বাংলাদেশ" মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে এবং ড্রিমার্স কনসাল্টেশন অ্যান্ড রিসার্চ টিম-এর সহযোগিতায় গত ২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ বাইতুল হক ও মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এই স্বাস্থ্যসেবামূলক ক্যাম্পে এলাকার অসহায়, নিম্ন আয়ের জনগণ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত থেকে সাধারণ চিকিৎসা, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

আয়োজক সংগঠন জানায়, সমাজে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।"

উপস্থিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ক্যাম্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আয়োজকদের প্রশংসা করে, তারা বলেন এই উদ্যোগ সমাজে মানবসেবার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

আয়োজনে– জমঈয়ত শুব্বান আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ সাংগঠনিক জেলা শাখা। **সহযোগিতায়–** ড্রিমার্স কনসাল্টেশন অ্যান্ড রিসার্চ টিম।

সকল অংশগ্রহণকারী, চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজকরা ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ পরিসরে এমন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দীর্ঘদিনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক অনেকদিন যাবত অসুস্থাবস্থায় (নিজ বাসভবনে) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সকলের প্রতি মহান আল্লাহর নিকট দু'আর আহ্বান জানাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، شِفَاءً عاجلا غير آجل.

রাগ সংবরণের প্রতিদান জান্নাত

(এক) সাহ্ল ইবনু মু'আয ইবনে আনাস আল জুহানী (রাযি.) তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রয়োগিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাগ দমন করে; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির সামনে তাকে এ সুযোগ দিবেন যে, সে তার পছন্দ মতো 'হুর'কে বেছে নিতে পারবে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৭৭৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৮৬, আলবানী হাসান)*

(দুই) আবূ দারদা (রাযি.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাকে এমন 'আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না, তাহলে জান্নাত তোমার হবে। *(মু'জামুল আওসাত- মা. শা., হা. ২৩৫৩)*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমাদের সমাজে কেউ পূর্ণভাবে শরী'আর অনুসরণ করতে চাইলে গোড়া বা কট্টর নামে তাকে ডাকা হয়। প্রশ্ন হলো– এভাবে কাউকে এমন নামে ডাকা কতটুকু বৈধ?*** *আমাতুর রহমান, দেলদুয়ার, টাংগাইল।*

জবাব : কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ পূর্ণভাবে মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য করণীয় কর্তব্য। এমন মান্যকারী ব্যক্তিকে গোড়া ও কট্টর বলে ডাকা খুব মন্দ এবং গর্তিত কাজ। এ ধরনের গর্হিত কাজ কাফিরদের সাথে সাদৃশপূর্ণ। মহান আল্লাহর বাণী–

﴿كَذٰلِكَ مَآ أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ﴾

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারাই তাকে বলেছে এতো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।" *(সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ৫২)*

আরবের কাফিররা যাদুকর ও পাগল ছাড়া মহানবী (ﷺ)-কে কবি বলেও মিথ্যারোপ করেছে। এই ধরনের মন্দ কর্ম আল্লাহর শত্রু এবং জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ মন্দ পরিণামগ্রস্ত জাহান্নামীদের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ○ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা মু'মিনদেরকে উপহাস করত। আর যখন তারা মু'মিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রূপ করত।" *(সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন : ২৯-৩০)*

তবে ধার্মিকতায় অবিচল ব্যক্তিকেও সঠিক ইল্‌মসহ 'আমল করতে হবে। অজ্ঞতাবশতঃ অহেতুক কোনো কড়াকড়ি যেনো তিনি না করেন, সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমার পরিচিত এক ব্যক্তির জারজ সন্তান রয়েছে। জানার বিষয় হলো– জারজ সন্তান আর পিতৃ সম্পদে ওয়ারিস হবে কি-না?*** *আব্দুস সাত্তার, সাভার, ঢাকা।*

জবাব : জারজ সন্তানের সাথে তার কথিত পিতার রক্ত সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। কারণ এই সন্তানটি অবৈধ পন্থায় জন্ম লাভ করেছে। এর জন্মলাভ শরী'আহ বহির্ভূত। মহানবী (ﷺ) বলেন–

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

"সন্তান নারীর প্রকৃত স্বামীর বলে নির্ধারিত, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ফারায়েয)*

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আল লাজনা আদ দায়িমাতে রয়েছে– বিশুদ্ধ হলো, সঠিকভাবে বিবাহ ছাড়া জন্ম দাতার সাথে রক্ত সম্পর্ক সম্পৃক্ত হবে না। যিনার মাধ্যমে জন্ম লাভ করা সন্তান যিনাকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং অবৈধ সন্তানটি যিনাকারীর ওয়ারিশও পাবে না। *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ দায়িমা- ২০/৩৮৭)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***সমাজে দেখা যায় অনেকেই ছোট বাচ্চাদের কপালে কালির ফোটা দিয়ে রাখে বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য। প্রশ্ন হলো– এমন কাজ কতটুকু সঠিক?*** *মুহা. নূরুদ্দীন পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।*

জবাব : প্রশ্নে উল্লিখিত কাজটি নিঃসন্দেহে অবৈধ ও শিরকপূর্ণ। বস্তুতঃ কপালে কালির ফোটা মেখে বদ নযর থেকে বেঁচে থাকার আশা করা গাইরুল্লাহর উপাসনা ও তাওয়াক্কুলের শামীল। অথচ প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে শরী'আহ সম্মত উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন অনিষ্টকারিতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বদ নযর থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা একান্ত জরুরি। আল্লাহ বলেন–

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾

"বলো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর উপরই নির্ভরকারীগণের নির্ভর করা কর্তব্য।" *(সূরা আয্-যুমার : ৩৮)*

বদ নযর থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে ঝাড়ফুঁক করা সঠিক 'আমল। নবী (ﷺ) হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)-কে এই দু'আ পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। দু'আটি হলো–

«أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

"আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়ত্বান, বিষাক্ত জিনিষ এবং বদ নযর হতে আশ্রয় চাই।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৩৭)*

এরূপ ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) ইসমা'ঈল ও ইসহাক (আলায়হিস সালাম)-কে ঝাড়ফুঁক করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৭১)*

সুতরাং বাচ্চাদের কপালে বদ নযর থেকে মুক্ত থাকতে কালি লাগানোকে শির্‌ক জেনে পরিত্যাগ করে আল্লাহর উপর ভরসা করা করণীয়। তদসঙ্গে উল্লিখিত দু'আ পড়ে তাদের ঝাড়ফুঁক করা শরী'আতসম্মত 'আমল। ☒

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ভেনেজুয়েলার দৃষ্টিনন্দন মুসলিম স্থাপনা

–মো. জি. রহমান

শেখ ইব্‌রা-হীম আল ইব্‌রা-হীম মসজিদ। ইব্‌রা-হীম ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয আল ইব্‌রা-হীম মসজিদটি ভেনেজুয়েলার একটি দৃষ্টিনন্দন মুসলিম স্থাপনা। মসজিদটি ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের এলো রেক্রিও জেলায় অবস্থিত যা লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। প্রথম স্থানে আছে ব্যুয়েন্স আয়ার্সে অবস্থিত ‘বাদশাহ ফাহাদ ইসলামিক কালচারার সেন্টার’।

১৯৮৯ সালে শেখ ইব্‌রা-হীম ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয আল ইব্‌রা-হীম এই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মসজিদের নকশা তৈরি করেন বিখ্যাত স্থপতি জুহাইর ফায়েজ। তার নকশা অনুযায়ী মাসজিদের মিনারের উচ্চতা ১১৩ মিটার এবং গম্বুজের উচ্চতা ২৩ মিটার। মোট আয়তন ৫০০০ বর্গফুট। ১৯৯৩ সালে কর্তৃপক্ষ মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত ঘোষণ করে। এখানে এক সাথে ৩৫০০ জন মানুষ সালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের মিনারটি লাতিন আমেরিকার অন্যতম উঁচু মিনার হিসেবে স্বীকৃত।

৪ বছরের মসজিদ নির্মাণ প্রজেক্ট শেষে মার্চ, ১৯৯৩ সালে কারাকাস ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধনী ভাষণে ভেনেজুয়েলার ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হাসান মাজজুব বলেন, “এটা একটা স্বপ্নের মতো, যা সত্য হয়ে আমাদের কাছে এসেছে।”

হাসান মাজজুব, যিনি ১৯৬৮ সালে লেবানন থেকে ভেনেজুয়েলায় আসেন, পেশায় একজন দোকানদার। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভেনেজুয়েলার মুসলিমদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে যাবে।

ভেনেজুয়েলায় ইসলামের আগমন : ভেনিজুয়েলা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে ক্যারিবীয় সাগরের তীরে অবস্থিত ফেডারেল প্রজাতন্ত্র শাসিত একটি রাষ্ট্র। মোট ২১টি রাজ্য নিয়ে ভেনেজুয়েলা গঠিত। দেশের সরকারি ভাষা স্প্যানিশ। তবে ইংলিশ, ফরাসি ও পর্তুগিজ ভাষারও প্রচলন রয়েছে। ভেনেজুয়েলার রাজধানী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম শহরের নাম কারাকাস। সরকারি হিসাব মতে, জনসংখ্যা প্রায় ৩০ মিলিয়ন। মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখের মতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভেনেজুয়েলাবাসী ইউরোপীয় ও প্রাচীন আমেরিকান আদিবাসী বংশোদ্ভূত জাতি।

১৯ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ আমেরিকার যেসব দেশ স্পেনীয় উপনিবেশ থেকে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সেগুলোর মধ্যে ভেনেজুয়েলা অন্যতম। তিনশ’ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভেনেজুয়েলা একটি স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল।

পনেরো শতকের শেষের দিকে ভেনেজুয়েলায় ইসলাম আগমন ঘটে; বিশেষত নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের লক্ষ্যে যেসব স্প্যানিশ পরিব্রাজক ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, তাঁদের দলের মুসলিম সদস্যের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলাম আগমন করে। ভেনেজুয়েলা আবিষ্কারের পর স্প্যানিশরা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে হাজার হাজার মুসলিম ক্রীতদাসকে নিয়ে আসে। ফলে ভেনেজুয়েলায় মুসলিমদের একটা বড় জনসংখ্যা তৈরি হয়।

পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিমদের ওপর স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ আর জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের ফলে একপর্যায়ে ভেনেজুয়েলা প্রায় মুসলিমশূন্য হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভেনেজুয়েলা স্পেনীয় উপনিবেশ থেকে মুক্তি পায়। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীতে সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন থেকে ক্রমাগত আরবদের আগমন অব্যাহত থাকে। কার্যত তাদের এ আগমনই ছিল ভেনেজুয়েলায় পুনরায় ইসলামের জাগরণের চালিকাশক্তি।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরবরা যখন এখানে আসে, তখন তারা ছিল অতি দরিদ্র সাধারণ ব্যবসায়ী। তবে সময়ের আবর্তনে নিজেদের প্রতিভা-যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও কুশলতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক্তারি ও অন্যান্য পেশার দ্বারা নতুন ভেনেজুয়েলা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

তাদের এ অবদান সত্তর ও আশির দশকে ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম কমিউনিটির প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাহায্য করেছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ভেনেজুয়েলার বেশ কয়েকটি শহরে মুসলিমদের জন্য ছোট ছোট নামায ঘর নির্মাণ করা হয়। অবশ্য কয়েক বছর আগে

৬৭ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২৭ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নতুন মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি আগের সে নামায ঘরগুলো সম্প্রসারণ করে বড় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু মসজিদের আওতাধীন কমপ্লেক্সে ইসলামিক স্কুল ও কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে মুসলিমরা ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন শহরে আবাসন গড়ে তুলেছেন। রাজধানী কারাকাস ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ভ্যালেন্সিয়া, পুনঞ্জো, মার্গারিটা এবং বারকুইসিমেটো ও অন্যান্য শহরে মুসলিদের বিস্তৃতি ঘটেছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাস করে রাজধানী কারাকাসে। ভেনেজুয়েলায় সুন্নী মুসলিমদের ১৫টি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে।

রাজধানী কারাকাসে অবস্থিত 'শেখ ইব্রা-হীম বিন 'আব্দুল 'আযীয আল-ইব্রা-হীম মসজিদ' (মসজিদে ইব্রা-হীমী) লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ইসলামী স্থাপত্য। এ মসজিদেই রয়েছে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু মিনার। অনুরূপ মসজিদ কমপ্লেক্সটির ভেতরে বেশ কয়েকটি বৃহৎ শ্রেণিকক্ষসমৃদ্ধ একটি ইসলামী স্কুল, প্রশাসনিক ভবন ও শরীরচর্চার জন্য একটি জিমনেসিয়ামও রয়েছে।

মার্গারিটা শহরে বিশালকায় সুদর্শন একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ কমপ্লেক্সটির আওতাধীন ভেনেজুয়েলার সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা ও সর্ববৃহৎ কবরস্থান রয়েছে। কমপ্লেক্সটি ৩০ হাজার বর্গমিটারের বেশি জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

গুরুত্বপূর্ণ শহর ভ্যালেন্সিয়ায় একটি বড় মাসজিদ, একটি মাদ্রাসা ও একটি কবরস্থান রয়েছে। এ শহরে ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত মুসলিমরা বসবাস করেন। ভেনেজুয়েলার অন্যান্য শহরেও মসজিদ, নামাযঘর এবং কিছু ইসলামী স্কুল বা মাদ্রাসা রয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় দা'ওয়াতি কার্যক্রম : কিছু ইসলামী সংগঠনের দা'ওয়াতী তৎপরতার কারণে ভেনিজুয়েলার মুসলিমরা কয়েক বছর আগে সেখানে বড় একটি ইসলামী দা'ওয়াতী জাগরণ দেখেছে। ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের কাছে সুন্দরভাবে ও বস্তুনিষ্ঠরূপে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতে 'ভেনেজুয়েলা কমিউনিকেশন সেন্টার' নামের একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইসলামের প্রচার-প্রসার, দা'ওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে এবং সরাসরি ফোকাসের ওপর ভিত্তি করে 'ভেনেজুয়েলা কমিউনিকেশন সেন্টার' মার্গারিটা শহরে অবস্থিত 'ইসলামী সঙ্ঘ ভেনিজুয়েলা'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম শিশুদের জন্য ইসলামী শিষ্টাচার এবং আররী শেখার জন্য গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বিভিন্ন কোর্সের আয়োজন করা হয়। ভেনিজুয়েলায় 'দা'ওয়াত ও তাবলীগে'র কার্যক্রম খুব সক্রিয়। দা'ওয়াত ও তাবলীগের সদস্য এবং অন্য সাধারণ মুসলিমদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার জনগণের কাছে, বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণির কাছে বিগত কয়েক বছরে ইসলাম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে বিপুল পরিমাণ ভেনিজুয়েলিয়ান নাগরিক ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে চলছে।

[সূত্র : উইকিপিডিয়া, কালেরকণ্ঠ, ইন্টারনেট।]

কবিতা

[৪১ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

মুসলিম জাতির আর্তনাদ

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
অধ্যায়নরত, মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

কণ্ঠে ভেসে আসে আজ ফিলিস্তিনের আর্তনাদ,
রক্তভেজা মাটির বুকে মাতৃকণ্ঠের ক্রন্দনসাদ।
শিশুরা কাঁদে,ঘর বাড়ি ভাঙে, তবুও শোনে আযানের সুর,
তাদের চোখে ভাসে জ্বলন্ত আগুন, অশ্রুজল ভরপুর।

মনে ভেসে ওঠে আরাকানের নীরব হাহাকার,
বিধ্বস্ত জীবন, জ্বলছে ভিটে অশান্তির অগ্নিঝর।
কবরেরও স্থান নেই, শরণার্থী পথে পথিক,
ক্ষুধার্ত শিশু জিজ্ঞাসে- "আমার অপরাধ কি?"

কাশ্মীরের তুষার ভেদে রক্তের নদী বইছে,
বন্দি মানুষের আর্তনাদ আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে।
চোখে আঁধার, বুকে শূন্যতা-কোনো সহায় নেই,
তাদের আর্তনাদ আজ দুনিয়ার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়।

ওহে মুসলিম জাতি! কেন নিদ্রিত তোমার প্রাণ?
কেন নীরবতার শিকলে বন্দী তোমার আহ্বান?
আজ ফিলিস্তিন, কাল হয়তো অন্য জনপদ,
উঠে দাঁড়াও, ভাঙো শৃঙ্খল-রুখে দাও যুল্মের পদ।

তোমার হাতে কুরআন, তোমার বুকে ঈমান,
কেন তবে তুমি নত, করছ না কোনো সংগ্রাম?
মুসলিমের আর্তনাদ যেন না থাকে বৃথা,
মহান আল্লাহর দ্বীনের পতাকা উড়ুক বিশ্বমাথা।

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

HAS

MEMBER
ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice